১৫০ বছর ধরে স্কুল কলেজে ভুল ইতিহাস পড়ানো হয়েছে, এখনও হচ্ছে

অমলেশ মিশ্র

150 Bachar Dhara Bhul Itihas Parana hoyeche, Ekhano Hochhe.
by Amalesh Mishra

গ্রন্থস্বত্ব : অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

প্রকাশক : অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

সংস্করণ : ২৫শে অক্টোবর, ২০১৪
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

লেখক : অমলেশ মিশ্র
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

অক্ষর বিন্যাস : তপন কুমার সাউ
মোবাইল : ৯৭৩২৮২৪০৫৯

প্রাপ্তিস্থান : প্রকাশক, কাঁথি

মূল্য : ৩০ টাকা মাত্র

১৫০ বছর ধরে স্কুল কলেজে ভুল ইতিহাস পড়ানো হয়েছে, এখনও হচ্ছে

ইতিহাস একটি খুবই প্রভাবশালী শক্তি। রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে ইতিহাসকে ব্যবহার করা যায় - করা হয়ও। যে জাতি তারই ইতিহাস ভুলে যায় বা তাকে বিকৃত করে বা গোপন করে সে জাতি সামগ্রিক বিনষ্টি বা ধ্বংসের পথে যায়। আবার কোন জাতিকে যদি সামগ্রিকভাবে বিনষ্ট তথা ধ্বংস করতে হয়, তবে সে জাতির ইতিহাস বিকৃত করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

ভারতের ইতিহাস-এর অনেক রকমের ভাষ্য ও বিবরণ পাওয়া যায়। কোনটি হিন্দুদের করা, কোনটি মুসলমানদের করা, কোনটি খৃষ্টানদের করা, কোনটি ইংরাজদের, কোনটি মার্কসবাদীদের, কোনটি বা নেহেরুবাদীদের। এগুলির প্রত্যেকটিই নিজেদের বৈশিষ্ট্যের রাজনীতি তৈরী করেছে এবং সেই রাজনীতি বাঁচিয়েও রেখেছে।

এই সব বিবরণ ও ভাষ্যগুলির মধ্যে কেবলমাত্র হিন্দুদেরটাই এদেশীয় সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র থেকে পাওয়া। অন্য বিবরণ ও ভাষ্যগুলি নানা ধরণের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উদ্ভাবন করেছে এবং এইগুলির রচনাকাররা বিদেশী আক্রমণের সুযোগের কারণে এদেশে বহু সংখ্যায় বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

ভারতের ইতিহাসের হিন্দু ভাষ্য ও বিবরণ অনুযায়ী — (১) খৃষ্ট জন্মের কয়েকহাজার বছর আগে থেকেই হিন্দু সভ্যতা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সভ্যতা ছিল যেমন নাকি উনবিংশ-শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী হয়েছে। (২) পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণ পৃথিবীর সব দেশেরই ভাষা এবং সাহিত্যে, ধর্মে এবং দর্শনে, বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে আজও হিন্দু সভ্যতার রেশ টিকে আছে। (৩) সুদীর্ঘকাল পৃথিবীব্যাপী অপ্রতিহতভাবে ক্ষমতা ও স্বাচ্ছন্দ্যভোগ করে তারা আত্ম সন্তুষ্টিতে ভোগে। ফলে যুদ্ধ বিদ্যা ও সীমান্ত সংরক্ষণের বিষয়ে শিথিলতা আসে যে কারণে ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন ধরণের বিদেশীরা এদেশ আক্রমণ করার সুযোগ পায়। (৪) প্রথমের দিকের আক্রমণকারীরা বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। পরের দিকের আক্রমণকারীরা কিছু ক্ষতি করলেও এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রমে মিলে মিশে যায়। (৫) বিদেশী আক্রমণকারী হিসাবে ইসলামীরাই প্রথম ভয়ঙ্কর ক্ষতি করেছে। তারা তাদের নৃশংস ও অমানবিক আদর্শ বিস্তার করতে গিয়ে এদেশের হিন্দুদের সুদীর্ঘকাল ধরে রক্ষিত ও পালিত মূল্যবোধ ও শ্রদ্ধাস্থানে দুর্বার আঘাত করেছে — এলাকা দখল করেছে — রাজ্য স্থাপন করেছে — এদেশের বহু যুগ চর্চিত সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অত্যাচারে ও নৃশংসতায় ধ্বংস করতে চেয়েছে, ব্যাপক ধর্মান্তর ঘটিয়েছে ভীতি ও প্রলোভনকে হাতিয়ার করে। (৬) খৃষ্টান তথা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ একই ধরণের বিদেশী এবং তারাও এল তাদের আদর্শ ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে

— এমন একটা সময়ে যখন ভারতীয়রা ইসলাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘকাল ধরে লড়াই করে কিছুটা সাফল্য আনলেও অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। (৭) ভারতীয় সমাজে যে সব অব্যবস্থা ও কুসংস্কার ছড়িয়েছিল - তা ঘটেছিল বিদেশী আক্রমণের কারণেই। অব্যবস্থা ও কুসংস্কারের কারণে বিদেশী আক্রমণ ঘটেনি।

ভারত ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা ও ভাষ্য আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতরা যেমন — স্বামী দয়ানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ খুব জোরের সঙ্গেই সমর্থন করলেন। শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন চন্দ্র পাল, লোকমান্য তিলক প্রমুখ যারা সেই যুগের স্বদেশী আন্দালনের নেতৃত্বে ছিলেন (১৯০৫-১৯১০) তারা গভীরভাবে এই ভাষ্য সমর্থন করতেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ভাষ্য ও বিবরণ প্রচণ্ড ধাক্কা খেল যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম তোষণ আরম্ভ করলেন — ইংরাজ বিরোধী সংগ্রামে তাদের সামিল করার উদ্দেশ্য নিয়ে। হিন্দুদের বলা হল — (১) তারা যেন তাদের প্রাচীন উন্নত সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব না করে তাতে মুসলমানরা আঘাত পেতে পারে। (৩) ইসলাম ধর্মকে হিন্দুধর্মের মত সমান শ্রদ্ধা সম্মান দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। (৩) ভারতের মুসলমানদের রাজ্যত্ব কালকে এদেশীয় শাসন ব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে হবে।

মুসলমান সম্প্রদায় কিন্তু এত 'সামান্য' সুবিধায় খুশী হল না। এমন কি ভারতের ইতিহাসকে মুসলিম স্বার্থে বিকৃত করেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন করা গেল না। কিন্তু যে বিপজ্জনক ঘটনাটি ঘটল তা হ'ল — ইতিহাসকে জ্ঞানত বিকৃত করা যায় এবং তাকে রাজনৈতিক স্বার্থ পরিপূরণে ব্যবহার করা যায় - এই ধারণা ও ব্যবস্থা চালু হয়ে গেল। ভারতের জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসহীন মার্কসবাদীরা এবং পাশ্চাত্য চিন্তন ও মননে পরিশীলিত ইণ্ডিয়ানরা এর বিশ্বাসঘাতী ব্যবহার আরম্ভ করে দিল। ভারতের ইতিহাসের নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও ভাষ্য পাওয়া যেতে থাকল ঐ বিকৃতিকে 'সত্য ইতিহাস' বলে ধরে নিয়ে।

(১) ভারতে ইংরাজদের শাসনের আগে জাতীয়তাবাদের কোন ধারণা ছিল না। (২) আর্যরা ভারত আক্রমণ করে দ্রাবিড়দের তাড়িয়ে দিল। (৩) যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার। (৪) বেঁচে থাকতে হলে লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। (৫) কর্তব্যে অবহেলা করে কেবল অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে ইত্যাদি কয়েকটি অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক তথা অযৌক্তিক ধারণা বিগত ১৫০ বছর ধরে ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল এবং সহজ মাধ্যম হিসাবে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং কিছু পরে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করা হল।

১৫০ বছর ধরে ব্যাপক প্রচেষ্টা ও প্রচারে যে অসত্য, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক ইতিহাস ভারতীয়দের মগজে ঢোকানো হয়েছে — তাকে সহজে দূর করা যাবে না। আনন্দের কথা যে ভারতের দেশজ ইতিহাসবিদরা এবং ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল কিছু বিদেশী ইতিহাসবিদরা ভুল ভাঙ্গানোর কাজ শুরু করেছেন। তবে সময় লাগবে।

খবর কাগজে পড়লাম যে বজরং দলের বিনয় কাটিয়ার তাজমহল বা তেজো মহালয় নিয়ে একটি মামলা করবেন। তার দাবী যে তথাকথিত তাজমহল আসলে ছিল

একটি শিব মন্দির, শাজাহান তা অধিগ্রহণ করে সমাধি বানিয়েছেন। আবদুল হামিদ লোহারী লিখিত ইতিহাস বই - বাদশানামায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে ৪০৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাদশানামা ফার্সী ভাষায় আরবী হরফে লিখিত। তাজমহল বা তেজো মহালয় আদপে একটি মূল সমাধি অথবা একটি মন্দির ভেঙ্গে সমাধি সে বিষয়ে পুরুষোত্তম দাস নাগেস ওক নামে এক ঐতিহাসিকের একটি পুস্তক আছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী তাঁর লেখা পুস্তক - 'মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি'-তে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন বহু তথ্য দিয়ে।

একটি কথা আমাদের সকলের জানা দরকার যে — ভারতবর্ষে মুসলমান যুগ সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস গত ১৫০ বছর ধরে আমাদের পড়ানো হচ্ছে না। যা স্কুল কলেজের ইতিহাস বই বলে কথিত আছে সেগুলিতে যা লেখা আছে সেগুলি সঠিক নয় বললে কম বলা হয় — সেগুলি ভুল।

ঐ যুগে (প্রায় এক হাজার বছর) হিন্দু ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস বেশ কম এবং যা আছে তা সত্য হলেও তার উপর নির্ভর করা হয় না। কিন্তু এই যুগে মুসলিম ঐতিহাসিকরা অনেক ইতিহাসের বই লিখেছেন। সেইসব বই আমাদের পড়ানো হয় না এমন কি অবহিতও করা হয় না। মুসলিম ঐতিহাসিকদের পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি অসত্য মনে করার কারণই নাই। তবু আমাদের ইতিহাস বইগুলিতে, যা স্কুল কলেজে পাঠ্য করা হয়েছে, মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণিত কাহিনী ও বিবরণ ব্যবহার করা হয় নি। অনেক ভুল, অসত্য এমনকি প্রকৃত ঘটনা বা মনোভাবের বিপরীত মনোভাব আমাদের পাঠ্য করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য কাজ করেছেন এইচ. এম. ইলিয়ট এবং জে. ডওসন। এই দু'জনের লিখিত বা সম্পাদিত পুস্তকটির নাম — হিসট্রি অফ্ ইণ্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইটস্ ওন হিসটোরিয়ানস্ (History of India as told by its own historians)। পুস্তকটি অষ্টম খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে। এই বই এখনও দিল্লীতে পাওয়া যাবে। (Low Price Publication, Nimari Commercial Centre, Ashok Bihar Phase-IV, New Delhi, 110052 মূল্য ১,৬৫০ টাকা)।

এই বইটির বৈশিষ্ট্য হ'ল — মুসলমান ঐতিহাসিকরা ভারতের মুসলিম যুগ সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুস্তকে যা লিপিবদ্ধ করেছেন এমন কি মুসলিম সম্রাট ও নবাব বাদশাহরা নিজেরা যা লিখেছেন আরবী বা ফার্সী ভাষায় সেগুলির ইংরাজী ভাষান্তর আছে। তথ্যসূত্র হিসাবে সমসাময়িক যুগের ঐতিহাসিক এবং সম্রাট বাদশাহদের লেখা বইগুলি অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। মুসলমান ঐতিহাসিকরা মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে নিশ্চয় মিথ্যা লিখবেন না। অথবা বাবর, আকবর বা জাহাঙ্গীর যখন আত্মজীবনী লিখবেন তাতে নিশ্চয় ঐতিহাসিক তথ্য অনেক নির্ভুল থাকবে।

একটি ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। শাহাজাহানের পিতা জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তার সেই বইতে তিনি তার ছেলে যুবরাজ খুরম্ (পরে শাহজাহান নামে পরিচিত) সম্পর্কে

বলতে গিয়ে লিখেছেন — 'আমি এই আদেশ দিলাম যে, এখন থেকে সবাই তাকে 'শয়তান' বলে ডাকবে। উপরন্তু আমার ইকবাল নামায় যেখানে যেখানে 'শয়তান' শব্দ আসবে সেখানে সেখানে 'শয়তান' বলতে তাকেই বুঝতে হবে।

"I direct that henceforth he should be called 'wretch' and whenever the word 'wretch' occurs in the Ikbalnama, it is he who is intended". (History of India as told by its own historians Elliot and Dawson. Vol-VI, Page-281)

এহেন শাজাহান — আমাদের স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে মহান শাজাহান — আদর্শ প্রেমিক নানারকম জাঁকজমকের প্রবর্তক ইত্যাদি বলে উল্লিখিত। শাজাহান যে প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিলেন — তা পরের কোন প্রবন্ধে উল্লেখ করব। বাবা যাকে 'শয়তান' বলেন আমরা তাকে 'মহান' বলে চালিয়ে দিয়েছি। এই রকমই আমাদের ইতিহাস বই। মূল কথা যেটি বলতে চাই সেটি হ'ল — ভারতের ইতিহাসের মুসলিম যুগ সম্পর্কে সত্য বিষয়টি আমাদের দেশের সব মানুষের জানা দরকার। ইতিহাস বই বলে পরিচিত পাঠ্যপুস্তকগুলি এ বাবদে একান্ত ভুল, মিথ্যা এবং বিপরীত চিত্র উল্লেখ করেছে এবং তা করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবেই।

উল্লিখিত ইলিয়ট ও ডওসনের পুস্তক ছাড়াও ১১ খণ্ডে প্রকাশিত দি হিষ্ট্রি এণ্ড কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পিপল্ (সম্পাদনা — আর. সি. মজুমদার) পড়া একান্ত প্রয়োজন। এই পুস্তকটি মুম্বাইতে পাওয়া যাবে।

(Bharatiya Vidya Vabhan, Kulapati K. M. Munsi Marg. Mumbai 400007 মূল্য - ৪,১৮৫ টাকা)।

এছাড়াও বিদেশী অনেক ঐতিহাসিক এবং ভারত ভ্রমণকারী ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের সেই সব পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনা ও তথ্যগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মনগড়া ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। যদি বা স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের সামান্যতম সত্য থাকে তাকেও মিথ্যা করার জন্য সরকারী নির্দেশনামা জারী করা হয়েছে।

এ রকম একটি উদাহরণ হল - প. ব. মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সার্কুলার নং - সিলেবাস/৮৯/১, তাং ২৮.০৪.৮৯ এই সার্কুলার অনুসারে মুসলমান যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে কোন কোন পুস্তক প্রণেতা তাদের বইগুলিতে যে দু'একটি ঐতিহাসিক সত্য উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি অশুদ্ধ বলে ঘোষণা করতে বলা হ'ল এবং সেই সব বাক্যের শুদ্ধ বলে কী লিখতে হবে তাও বলে দেওয়া হ'ল। যেমন —

১। ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রকাশক চক্রবর্তী এণ্ড সন্স) বইতে আছে — "সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করে প্রায় ২ কোটি দিরহাম (স্বর্ণমুদ্রা) মূল্যের মুল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছিল। সোমনাথের শিবলিঙ্গ গজনীতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার মসজিদে তা সিঁড়ির মত ব্যবহার করেছিল।" পৃ. ৮৯

লেখককে নির্দেশ দেওয়া হল — "সোমনাথের শিবলিঙ্গ ....সিঁড়ির মত ব্যবহার করেছিল।" অংশটি বাদ দিতে হবে।

২। ড. ভট্টাচার্য্যের ঐ বইর ১১২ পৃষ্ঠায় ছিল "মধ্যযুগে .... অমুসলমানদের মৃত্যু অথবা ইসলাম, এই দুইয়ের মধ্যে একটা বেছে নিতে হ'তো।"

নির্দেশ দেওয়া হ'ল — সমস্ত বিষয়টা বাদ দিতে হবে।

৩। শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বই ভারতের ইতিহাস (প্রকাশক ঃ নর্মদা পাবলিশার্স) এ লিখলেন "মুসলমানরা যাতে দেখতে না পায় সেইজন্য হিন্দু রমনীদের ঘরে বন্ধ করে রাখা হ'ত।" পৃ. ১৮১

নির্দেশ দেওয়া হ'ল — পুরোটা বাদ দিতে হবে।

৪। নলিনীভূষণ দাসগুপ্তর লেখা ইতিহাসের কাহিনী (প্রকাশক ঃ বি. বি. কুমার) বইতে ছিল —

"বিখ্যাত ঐতিহাসিক টড-এর মতে আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রানা রতন সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে হস্তগত করা।" পৃ. ১৩২

'ইসলামী আইন অনুসারে অমুসলমানদের সামনে তিনটি রাস্তা খোলা ছিল — হয় মুসলমান হও, নতুবা জিজিয়া দাও অথবা মৃত্যু বেছে নাও। যে কোন ইসলাম শাসিত রাজ্যে যে কোন অমুসলমানকে এই তিনটির মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে হ'ত।" পৃ. ১৫৪

"প্রথম দিকের মুসলমান শাসকরা বলপূর্বক হিন্দুদের মুসলমান করে ইসলামের সাম্রাজ্য বাড়াতে খুবই তৎপর ছিল।" পৃ. ১৬১

নির্দেশ ছিল — পুরোটাই বাদ দিতে হবে।

৫। পি. মাইতির লেখা ভারতের ইতিহাস (প্রকাশক ঃ শ্রীধর প্রকাশনী) এ ছিল — "অনেকের মতে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই হিন্দু সমাজে পর্দার প্রচলন শুরু হয়।" পৃ. ১৩৯

"আলাউদ্দিন রানা রতন সিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করতে মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন।" পৃ. ১১৭

নির্দেশ ছিল — পুরোটাই বাদ দিতে হবে।

৬। স্বদেশ ও সভ্যতা বইতে ড. পি. কে. বসু ও এ. বি. ঘটক (প্রকাশক ঃ অভিনব প্রকাশন) লিখলেন — "ইসলাম অত্যান্ত অমানবিক ও নৃশংস উপায়ে নিজেকে ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। তাই তা ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির মিলনের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল।" পৃ. ১৪৫

নির্দেশ ছিল — পুরোটাই বাদ দিতে হবে।

৭। পুস্তকের নাম — ভারত কথা। লেখক - জি. ভট্টাচার্য। প্রকাশক ঃ বুলবুল প্রকাশন। "মুসলমানরা ভারতীয়দের উপর তাদের ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে দিতে অকথ্য অত্যাচার ও অন্যান্য অমানবিক পন্থা গ্রহণ করত।" পৃ. ৪০।

নির্দেশ ছিল — পুরোটাই বাদ দিতে হবে। লিখতে হবে — 'ইসলামের জাতিভেদের স্থান নাই। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের অনুপ্রেরণা হিন্দুদের মধ্যে এক নবজাগরণ সূচনা করে। ফলে নীচ বর্ণের হিন্দুরা ইসলাম গ্রহণ করে।"

এইভাবে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। এগুলি প্রমাণ করে কিভাবে বিকৃত ইতিহাস, ভুল ইতিহাস, মিথ্যা ইতিহাস আমাদের স্কুল কলেজে পড়ানো হয়। এই বিকৃত ও ভুল ইতিহাস কেন পড়ানো হয়ে আসছে তার কারণ আছে। সেগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ করব। তবে তার আগে ইতিহাস বিকৃতির ও ভুল ইতিহাসের আরও কয়েকটি প্রমাণ হাজির করা দরকার।

বিগত ১৫০ বছর ধরে আমাদের ইতিহাস বইগুলিতে লেখা হয়ে আসছে, ফলে পঠিত হয়ে আসছে যে আর্য নামে এক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। বেদ আর্যদের তৈরী ইত্যাদি। এখন জানা গেছে যে আর্য নামে কোন জাতি ছিল না। আর্য একটি সংস্কৃতির নাম। আর্যরা বাইর থেকে এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেনি। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে আর্য সভ্যতা সংস্কৃতির কোন বিরোধ ছিল না। কিন্তু এখনও বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী বা ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিষয়ে ধারণা পরিবর্তন করেননি। ইতিহাসের বইতে এখনও আর্য আক্রমণের কল্পিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের ছেলে মেয়েরা সেই পরিত্যক্ত তত্ত্ব পড়ছে — জানছে এবং বিশ্বাস করছে। আর্য আক্রমণ তত্ত্ব যে নেহাতই একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাল্পনিক কাহিনী — তা ছেলে মেয়েদের জানাতে গেলে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের লেখার সম্পূর্ণ পরিবর্তন চাই।

বাবর, আকবর, শাজাহান, সুলতান মামুদ, কুতুবুদ্দীন আইবক বা ইলতুতমিস সম্পর্কে এইরকম সব ভুল এবং বিকৃত তথ্য আমাদের পাঠ্যপুস্তকে রয়েছে। কুতুব মিনার, লালকিল্লা, তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি বা এই ধরণের ঐতিহাসিক ইমারতগুলি সম্পর্কেও ভুল এবং অসত্য কাল্পনিক কাহিনী আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বহুকাল ধরে লিপিবদ্ধ, ফলে পঠিত হয়ে হয়ে আসছে। আশ্চর্যের বিষয় মুসলমান ঐতিহাসিকরা এসব বিষয়ে যে সব কথা লিখে গেছেন — সেগুলিও বাতিল করে দিয়ে কোনও এক অসৎ উদ্দেশ্য ভুল ইতিহাস লিখিত ও পঠিত হয়ে আসছে।

আর্য আক্রমণ তত্ত্ব নিয়ে ইতিপূর্বেই আমার রচিত পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এবার ভারতে মুসলিম যুগের কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করব। আমি নিশ্চিত নই যে এই প্রবন্ধগুলি বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মত পরিবর্তন করবে কি-না। তবে একথা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে এইসব বিষয়ে যা লেখা হয়েছে তার কোন তথ্যসূত্র নাই — সেগুলি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত — উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা বলেই তথ্যসূত্র পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি যা বলতে চাইছি তার পিছনে উপযুক্ত তথ্যসূত্র উল্লেখ করব। বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী যোগ্য গবেষণা করেছেন, পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। সে তুলনায় আমার এই প্রচেষ্টা নিতান্তই নগন্য। তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, জঞ্জাল সরানোর চেষ্টা করতে হবে।

আর্যরা বহিরাগত না হলেও মুসলমান আক্রমণকারীরা ও ইংরাজরা অবশ্যই বহিরাগত। এই বহিরাগতদের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য আর্য আক্রমণ তত্ত্ব রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ পার্লামেন্টে মেকলের বক্তৃতা এবং ম্যাক্সমুলারের লিখিত পত্র খুব নগ্নভাবেই উল্লেখ

করেছে যে ভারতীয় মহান সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে ভারতীয়দের হীনমন্য করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি সকলের নজর পড়া দরকার যে খৃষ্টীয় করণ ও ইসলামীকরণের ফলে পৃথিবীর বহু সুপ্রাচীন দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। গ্রীস, রোমসহ ইউরোপীয় দেশগুলি খৃষ্টীয় করণের পর নিজস্ব প্রাচীন ইতিহাস হারিয়েছে। ইরাক, ইরান, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশ ইসলামীকরণের পর তাদের প্রাচীন ইতিহাস হারিয়েছে। বৃটিশরা আমেরিকায় বসতি স্থাপন করার পর মায়া, আজটেক প্রভৃতি সভ্যতা লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু ভারতে ইসলাম এবং খৃষ্টান ব্যর্থ হয়েছে কারণ প্রায় ২৩০০ বছর ধরে (খৃ. পূ. ৩২৩ থেকে ১৯৪৭ খৃ.) ভারতীয়রা নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি, স্বাধীনতা রক্ষা করার সংগ্রাম করেছিলেন। পৃথিবীর কোন দেশে এ ঘটনা ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে আমার লিখিত যোদ্ধা ভারতবাসী পুস্তিকাটি পাঠ করা যায়।

কিন্তু বিদেশী মুসলিম আক্রমণকারীরা ভারতকে সম্পূর্ণভাবে ইসলামায়িত করতে পারেনি। মুসলমান শাসকরা তাদের ব্যাপক ধ্বংস লীলার মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসে অনেক অপূরণীয় ক্ষতি করেছে — বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়কে তারা লুপ্ত করলেও সম্পূর্ণ লোপাট করতে পারেনি। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, উজ্জয়িনি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে। মূল্যবান পুঁথি সমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছে। বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পুঁথি চিরকালের মত লুপ্ত হয়েছে। ভারতীয় পুঁথি জ্বালিয়ে স্নানের জল গরম করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে বিদেশী ইংরাজরা গ্রন্থ জ্বালায়নি বা পাঠাগার ধ্বংস করেনি ঠিকই তবে তারা সুকৌশলে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করছে। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে বানিয়েছে যাতে স্বাভিমানহীন একদল ভারতীয় তৈরী হবে যারা দাসত্বের মনোভাব নিয়ে পরিচালিত হবে। হলও তাই।

ডক্টর রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী মন্তব্য করেছেন যে — বিদেশী বৃটিশ শক্তি ভারতের ইতিহাস বিকৃতির যে শিলন্যাস করেছিল, স্বাধীন ভারতের রাজনীতিকদের মুসলিম তোষণের নীতির ফলে তা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করল। ইংরাজদের সুকৌশল মিথ্যা প্রচারে যে দুটি ধারণা ভারতীয়দের মধ্যে চূড়ান্ত প্রভাব ফেলেছিল — তার একটি হল আর্য আক্রমণ তত্ত্ব এবং অপরটি হল বৃটিশ আসার আগে ভারতীয়দের মধ্যে কোন জাতীয়তাবোধ ছিল না। এই দুটি তত্ত্বই ঋষি অরবিন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের মত মনীষীরা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতারা মূলত মেকলে শিক্ষায় ও বিদেশী বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হওয়ার কারণে এই দুই মিথ্যা তত্ত্বকেই সমর্থন করলেন। ভারত রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিত্ব মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে গভীর কিছু পড়েছেন বা চিন্তা করেছেন এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অথচ কংগ্রেসের নেতা হওয়ার কারণে তাদের কথাই শেষ কথা। তাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষ একটি মিশ্র সংস্কৃতির দেশ, এখানে হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষ কোন স্থান বা প্রাধান্য নাই। তাদের মতে ইংরাজরা বিদেশী হলেও মুসলিমরা নয়। মুসলিম আক্রমণ ও ভারত দখলের পুরো ইতিহাসটাকেই তারা অস্বীকার করলেন। তারা ভাবলেন ইংরাজ বিরোধীতায়

মুসলমানদের সামিল করতে হবে, কংগ্রেসের মধ্যে আনতে হবে। এর থেকেই জন্ম নিল — মুসলিম তোষণের বর্তমান ধারা। ফলে ইতিহাসের পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে যা লেখা আছে সেগুলি অস্বীকার করা হলো এবং চাপা দেওয়া হল। এর সঙ্গে পরবর্তীকালে যুক্ত হল মার্কসবাদীরা। ইসলাম-মার্কস-মেকলে চক্র ভারতের ইতিহাসের বিকৃত পাঠ্যপুস্তক রচনা করল। ৭১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু দেশ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভারতের মাটিতে সীমাহীন বর্বরতার সূত্রপাত হয়। এর প্রায় ৩০০ বছর পরে গজনীর সুলতান মামুদের ভারতের লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে সেই বিভীষিকাময় বর্বরতার পুনরানুষ্ঠান হয়। পরবর্তী ৭০০ বছর এই বর্বরতা পুরোদমেই চলছে।

এইসব ইতিহাস মুসলমান ঐতিহাসকিরাই নিজেদের গ্রন্থে লিখে গেছেন। আর কিছু বিদেশী ভ্রমণকারীর বর্ণনায় লিপিবদ্ধ আছে।

আমাদের স্কুল কলেজের পড়ুয়াদের জন্য যে সব ইতিহাস বই পাঠ্য করা হয়েছে সেগুলিতে সত্য ঘটনা খুব কম। সবই প্রায় কাল্পনিক। এমন কি পরিপূর্ণ মিথ্যা দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করে তাতে সত্যের ছাপ দেওয়া হয়েছে। এই ইতিহাস বিকৃতির পিছনে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মেকলে পন্থী ভারতীয় এবং মার্কসীয় দর্শনে আপ্লুত মার্কসপন্থীরা রয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কংগ্রেস এই ইতিহাস বিকৃতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে, পুষ্ট করেছে। বিকৃত ইতিহাস তারা রক্ষা করেছে, তাদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে। শ্রী অরবিন্দ, কবিগুরু বা বিবেকানন্দের বাণী তারা গ্রাহ্য করেনি। সেই মিথ্যা, সেই বিকৃতি আজও ব্যাপক। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বই থেকেই অনেক সত্য বেরিয়ে আসে। তাজমহল বা শাজাহানের ঘটনাও এইরকম। ডক্টর রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারীর একটি বই আছে। বইটির নাম — 'মিথ্যার আবরণে দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি'। (প্রকাশক ঃ গ্রন্থরশ্মি, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, মূল্য - ৪৫ টাকা।) এই বইতে ঐতিহাসিক সত্য নিয়ে মোটামুটি বিস্তৃত আলোচনা আছে। তাজমহল প্রসঙ্গে পুরুষোত্তম দাস নাগেশ ওক এর বইটির কথা অনেকেই জানেন। (The Tajmahal is a Temple Palace, ভাষান্তর ঃ দীপক কুমার ভট্টাচার্য্য, অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, ৩৬ কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯)। কিন্তু মোল্লা আবদুল হামিদ লাহোরী রচিত 'বাদশানামা'র প্রথম খণ্ডের ৪০৩ ও ৪০৪ পৃষ্ঠায় তাজমহলের যে ইতিহাস আছে — ড. ব্রহ্মচারীর বইতে ঐ ইতিহাস লাহোরীর পুস্তক থেকে আরবী ভাষায় প্রতিলিপি আছে। পৃ. ৮৩। এই লেখা থেকেই স্পষ্ট যে শাজাহান তাজমহল তৈরী করেন নি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সম্ভবতঃ মোল্লা লাহোরীর 'বাদশানামা'-র ঐ ৪০৩-৪০৪ পৃষ্ঠা জানা ছিল না বা শাজাহানের আসল চেহারা যে জাহাঙ্গীর লিখেছিলেন তা জানা ছিল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতা বাঙ্গালী মাত্রকেই প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐ কবিতায় শাজাহানের যে ছবি কবিগুরু এঁকেছেন — তা সম্পূর্ণ ভাবে অনৈতিহাসিক। একই ভাবে পাঠকদের শাজাহানের সম্পর্কে দুর্বল করে তোলে ডি. এল. রায়-এর শাজাহান নাটকটি। কবিগুরু বা ডি. এল. রায় শাজাহানকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন — মুসলমান ঐতিহাসিকদের ইতিহাস পড়লে সে চিত্র তো পাওয়াই যায় না — পাওয়া যায় এক বিপরীত চরিত্রকে।

বিদেশী লেখকদের মধ্যে Keene-র Handbook for Visitors to Agra and its neighbourhood-এ শাজাহান সম্পর্কে লেখা আছে 'দম্ভ ও স্বেচ্ছাচারিতায় শাহাজাহান সমস্ত মোগল সম্রাটকে অতিক্রম করেছিলেন। তিনিই হলেন প্রথম মোগল সম্রাট, যিনি সিংহাসনকে নিষ্কন্টক করতে সকল সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাইকারী হারে হত্যা করেছিলেন। স্যার টমাস রো শাহজাহানকে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। তাঁর মতে, শাহজাহান ছিলেন দাম্ভিক ও চূড়ান্তভাবে গর্বিত এক মানুষ এবং নিজেকে ছাড়া আর সকলের প্রতি ছিল অসীম ঘৃণা।"

"একদা বাদশার গোচরে এল যে তার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বিধর্মী কাফেরদের শক্তঘাঁটি বারাণসীতে অনেক পুতুল পূজার মন্দির তৈরী শুরু হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যায়। কিন্তু বর্তমানে কাফেরের দল, সেই সব মন্দির সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। ধর্মের রক্ষক মহানুভব সম্রাট আদেশ জারী করলেন যে — বারাণসী সহ তার রাজ্যের যেখানে যেখানে আধাআধি মন্দির খাড়া আছে সব ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তার আদেশে এলাহাবাদ প্রদেশের বারাণসী জেলায় ৭৬টি মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।" (আবদুল হামিদ লাহোরী — 'বাদশানামা' পৃ. ৪৪৯ Elliot & Downson Vol. VII, P-36)

সম্রাট শাহাজাহানের পরধর্ম সহিষ্ণুতার চেহারা এইভাবেই তার সভাসদ জীবনকার লোহারী বর্ণনা করেছেন। এই রকম অনেক ঘটনা ও বর্ণনা লাহোরীর বাদশানামায় পাওয়া যায় যা ইলিয়ট এবং ডসন তাদের পুস্তকে এবং আর. সি. মজুমদার সম্পাদিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। প. বঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা খুবই ভ্রমণ প্রিয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পর্যটন স্থানে যত পর্যটক যান — তাদের মধ্যে বাঙ্গালীরাই সম্ভবতঃ সংখ্যাগুরু। সব বাঙ্গালীতো ভ্রমণে যেতে পারেন না। যারা বোনাস পান, ভাল রোজগার করেন অর্থাৎ মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তরাই মূলত ভ্রমণ বিলাসী। তাদের ভ্রমণ স্থানগুলির মধ্যে দিল্লী আগ্রা ইত্যাদি থাকেই।

দিল্লী আগ্রায় ভ্রমণে যত সব প্রসাদ দুর্গ ইত্যাদি দেখা যায় - গাইডরা বলেন, ইতিহাস বইতেও পড়ি যে সবই হয় এই বাদশাহ নতুবা ঐ বাদশাহ বানিয়েছেন। দিল্লীর ও আগ্রার যাবতীয় দুর্গ প্রাসাদ অট্টালিকা, ইমারৎ সবই যদি বাদশাহরা নির্মাণ করেছিলেন, তাহলে তার আগে যে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন তারা থাকতেন কোথায় ? তাদের কি কোন প্রাসাদ, অট্টালিকা, উদ্যান, মন্দির, মূর্তি কিছুই ছিল না ? তারা কি সবাই কুটীরে বসবাস করে রাজত্ব চালাতেন ? এই প্রশ্ন উঠবেই।

১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে রাজপুত সম্রাট মহারানা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে মহম্মদ ঘুরি দিল্লী দখল করেন। এরও প্রায় ৪০০ বছর পরে (১৫২৬ খৃ.) মুঘলরা দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। প্রশ্ন উঠেছে ১১৯২-র আগে যারা দিল্লীতে রাজত্ব করেছিলেন তাদের ইমারৎ অট্টালিকা কোথায় গেল ? আমাদের পাঠ্যপুস্তক ইতিহাসে তো তার কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। একমাত্র মাটির কুটীরে এই সব রাজা সম্রাটরা বসবাস করলে — সেগুলি ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া সম্ভব। বহিরাগত মুসলিম শাসকরা স্যারা ভারতবর্ষ জুড়ে

বহু দুর্গ ও প্রাসাদ দখল করেছেন তার ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। অথচ দিল্লী আগ্রায় হিন্দু রাজাদের কোন দুর্গ বা প্রাসাদ ছিল না — এটা সম্ভব হয় কী করে ? আমরা বছরের পর বছর ইতিহাস বই পড়েছি, দিল্লী আগ্রা বেড়াতে যাচ্ছি, বহিরাগত মুসলিম শাসকদের ইমারৎ ও কিল্লা দর্শন করছি। কিন্তু একবারও তো ভাবছি না যে দিল্লী আগ্রায় হিন্দু রাজাদের আমলে অন্ততঃ ১১৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোন দুর্গ বা প্রাসাদের উল্লেখ পাচ্ছি না কেন ?

মুসলমান ঐতিহাসিক হাসান নিজামীর লেখা — তাজ-উল-মাসিরে একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তিনি তার ঐ পুস্তকের লিখেছেন — "মহম্মদ ঘোরী দিল্লী পৌঁছে সেখানে একটা দুর্গ দেখতে পেলেন, উচ্চতা ও মজবুত গঠনের দিক দিয়ে যা অদ্বিতীয় এবং ভূখণ্ডে এ রকম দুর্গ আর একটিও ছিল না।"

(ইলিয়ট ও ডসনের বই। দ্বিতীয় খণ্ড - পৃ. ২১৬)

এই দুর্গটা দিল্লী থেকে উধাও হয়ে গেল ? হাসান নিজামীর কথায় ঐ রকম দুর্গ সপ্ত ভূখণ্ডে আর একটিও ছিল না। পাঠক ও ভ্রমণকারীরা যারা দিল্লীর লালকেল্লা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে — ঐখানে ফার্সী ভাষায় লেখা একটি ফলক আছে — ঐ ফার্সী ভাষায় লেখাটির বঙ্গানুবাদ অনেক ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকেও আছে। ঐ ফার্সী কবিতার বঙ্গানুবাদ এইরকম —

'পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে তবে তা এখানে, তা এখানে।' ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে সম্রাট শাহজাহান এই ফার্সী কবিতার ফলক লালকিল্লায় বসিয়েছেন। ইতিহাস বই একথাও বলে যে লালকিল্লা শাহজাহান তৈরী করেছিলেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। হাসান নাজিমীর থেকে শাহজাহানের সময়ের মধ্যে প্রায় ৫০০ বছরের তফাৎ। কিন্তু দুর্গের বর্ণনায় প্রায় একই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

হাসান নিজামীর প্রায় ১০০ বছর পর এবং শাহজাহানের সময়ের প্রায় ৪০০ বছর আগে মিনহাজ-উস-সিরাজ একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম — তাবাকৎ-ই-নাসিরি। এই গ্রন্থে বক্তিয়ার খিলজীর ১২৪৩ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। দিল্লীর এক মর্মর প্রাসাদে বক্তিয়ার একটি হাতির সঙ্গে লড়াই করেন।

(ইলিয়ট ও ডসনের বই। দ্বিতীয় খণ্ড - পৃ. ২০৬-২০৭)

ড. রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী তার বইতে উল্লেখ করেছেন যে কথিত দিল্লীর ঐ মর্মর প্রাসাদ লালকিল্লা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কারণ হাতির সঙ্গে লড়াই করার মত প্রাসাদ চত্বর দিল্লীতে আর নাই।

ভারতের হিন্দু সভ্যতা যে কত পুরানো তা আজ অনেকাংশে নির্ণীত হয়েছে। মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থই যে আজকের দিল্লী তারও প্রমাণ রয়েছে। এমন কি মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাদের বইতে তা উল্লেখ করেছেন। আমাদের পূর্বোল্লিখিত ঐতিহাসিক হাসান নিজামী তার তাজ-উল-মাসির গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন —....। নিজামী ছিলেন কুতুবুদ্দীন আইবকের সমসাময়িক। দেখা যাচ্ছে হাসান নিজামী ও মীনহাজ উস সিরাজ রচিত দুটি ইতিহাস বইতেই পাওয়া যাচ্ছে যে শাজাহানের অনেক আগেই লালকিল্লার অস্তিত্ব ছিল। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শাজাহান তা নির্মাণ করেছিলেন — এটি ঐতিহাসিক সত্য নয়।

১১৯২ সালে মহম্মদ ঘোরী যখন দিল্লী দখল করলেন তখন তিনি সপ্ত পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না এমন একটি প্রাসাদ পেলেন। বখতিয়ার খিলজী প্রায় ৫০ বছর পরে ১২৪৩ সালে দিল্লীর এক মর্মর প্রাসাদে হাতির সঙ্গে লড়াই করলেন। এবার ১২৯৬ সালে অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজীর ৫০ বছর পরে হিজরী ৬৯৫ (১২৯৬ খৃ.) তে আলাউদ্দীন বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ধূমধামের সঙ্গে দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করলেন। তিনি দৌলতখানা-ই-জুলুস এর সিংহাসনে বসলেন, তারপর 'কুশক্-ই-লাল' বা লাল প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সেখানেই তিনি তার বাসস্থান নির্বাচন করলেন।"

জিয়াউদ্দীন বারণি নামে এক মুসলিম ঐতিহাসিক তার রচিত তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে এই কথাগুলি লিখেছেন।

(ইলিয়ট ও ডসনের বই। তৃতীয় খণ্ড - পৃ. ১৬০-১৬১)

দিল্লী ভ্রমণকারীরা জানেন যে দিল্লীতে দুটি কেল্লা আছে। একটিকে 'লাল কিলা' এবং অপরটিকে 'পুরানি কিলা' বলা হয়। অতুল চন্দ্র রায় তার ইতিহাস বইতে (ভারতের ইতিহাস, মৌলিক লাইব্রেরী, কলকাতা) লিখেছেন যে পুরানো কিল্লা শেরশাহের তৈরী। তাহলে একটি শেরশাহের (১৫৩০-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) অপরটি শাজাহানের (১৬৩৮-৪৮ সালের মধ্যে)। তাই প্রশ্ন তুলেছিলাম দিল্লীর হিন্দু রাজারা ১১৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোথায় থাকতেন? অথচ ইতিহাস বলছে দিল্লীই ইন্দ্রপ্রস্থ। তিনজন মুসলিম ঐতিহাসিক তিনটি বিভিন্ন সময়ে (১১৯২, ১২৪৩, ১২৯৬ খৃ.) লিখিত ইতিহাসে দিল্লীর কেল্লার কথা উল্লেখ করলেন অথচ আমাদের স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে তা সম্পূর্ণ চেপে যাওয়া হল। কৃতিত্ব দেওয়া হল শেরশাহকে আর শাহাজাহানকে। শেরশাহ সম্পর্কে তো আমাদের পাঠ্যপুস্তক ইতিহাসে অকল্পনীয়, অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মাত্র ৫ বছরের রাজত্বে তাকে বারবার যুদ্ধ করতে হয়েছে — তা সত্ত্বেও রাস্তা, কিল্লা প্রভৃতি বানাতে তিনি সময় কোথায় পেলেন — তা একবার কেউ ভেবেও দেখলেন না।

শেরশাহের আগে দিল্লীতে তাহলে কোন কেল্লাই ছিল না। ১১৯২ সাল পর্যন্ত হিন্দু রাজা সম্রাটরা না হয় মাটির ঘরে অথবা গাছের তলায় বসবাস করতেন ধরে নেওয়া গেল। কিন্তু ঐতিহাসিক হাসান নিজামী তার ইতিহাস গ্রন্থ — তাজ-উল-মাসির এ যে উল্লেখ করলেন মহম্মদ ঘোরী দিল্লী এসে একটা দুর্গ দেখতে পেলেন যা গঠনের দিক থেকে ছিল অদ্বিতীয় এবং সপ্ত ভূখণ্ডে এ রকম দুর্গ আর একটিও ছিল না — সেটি তাহলে কোন্ দুর্গ? শেরশাহ তো এলেন মহম্মদ ঘোরীর ৪০০ বছর পরে। আর শাহাজাহন এলেন ঘোরীর ৫০০ বছর পরে।

এরপরও আমাদের মানতে হবে যে লালকিলা শাহাজাহানের তৈরী ? হতে পারে এবং হয়েছেও শাহাজাহান লালকিল্লার সংস্কার করেছেন।

একই প্রশ্ন উঠে আগ্রার দুর্গ নিয়েও। মহম্মদ ঘোরী যখন আগ্রা আক্রমণ করেন তখন আগ্রায় রাজপুত রাজা জয়পাল রাজত্ব করতেন। রাজা জয়পালের দুর্গ এত দুর্ভেদ্য ছিল যে হাজার বার আঘাত করেও তার হৃদয় কম্পিত করা যায় না। আগ্রার দুর্গ বালির

মধ্যে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। (মুসলিম কবি দেওয়ান-ই-সলমনের কবিতা ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর বই, পৃ. ৩১)

অপরদিকে নিজামুদ্দীন আহম্মদ তার তাবাকৎ-ই-আকবরী নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে আকবর আগ্রায় একটি নতুন দুর্গ নির্মাণের আদেশ দেন এবং চার বছরের মধ্যে সেই দুর্গ নির্মাণ শেষ হয়। (ইলিয়ট ও ডসনের বই। পঞ্চম খণ্ড-পৃ. ২৯৫)।

এই দুর্গের দেওয়াল ৮ গজ চওড়া। যারা আগ্রা দুর্গ দেখেছেন — তারা কি মাত্র চার বছরের মধ্যে ঐ দুর্গ তৈরী হওয়া সম্ভব বলে কল্পনা করতে পারবেন সেই যুগে যখন আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়নি। আকবর নামায় উল্লেখ আছে ৮ বছরের (আকবরনামা ২য় খণ্ড পৃ. ৩১১) সময়ের কথা। কোনটা ঠিক ? ৪ বছর অথবা ৮ বছর ?

নিজামুদ্দীন তার উল্লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে আগ্রায় একটি ইঁটের তৈরী দুর্গ ছিল। জয়পালের দুর্গটি যদি ইঁটেরই হত তাহলে হাজার আঘাতেও কাঁপল না কেন? আগ্রার দুর্গ নির্মাণে ৪ বছর সময় লেগেচিল বলে নিজামুদ্দীন বলেছেন, আবুল ফজল তাঁর আকবরনামায় বলেছেন ৮ বছর। আবার জাহাঙ্গীর লিখেছেন যে আগ্রা দুর্গ তৈরী করতে ১৫ বছর সময় লেগেছিল। (ভিনসেন্ট স্মিথ আকবর দি গ্রেট মুঘল, পৃ. ৭৬)

বাবর যখন আগ্রায় প্রথম এলেন (৪ মে ১৫২৬) তার আগেই আগ্রা দুর্গের অস্তিত্ব ছিল এবং বাবর পুত্র হুমায়ুনকে আগ্রার দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আকবর হুমায়ুনের ছেলে। বাবা যে দুর্গ রক্ষা করেছিলেন ১৫২৬-৩০ খৃষ্টাব্দে ছেলে সেই দুর্গ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন কী করে ?

বাস্তব এই দাঁড়ায় যে আকবর আগ্রায় ৪ বছরে বা ৮ বছরে বা ১৫ বছরে কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন নি। হিন্দু রাজা জয়পালের দুর্গরই সংস্কার হয়েছিল ৪ বা ৮ বা ১৫ বছর ধরে।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানই সঠিক উত্তর দিতে পারে। আমরা কেবল অসঙ্গতির দিকটি উল্লেখ করলাম। দিল্লী, আগ্রা বা এই ধরণের রাজধানী শহরগুলিতে হিন্দু রাজা সম্রাটরা নিশ্চয় গাছতলায় বা মাটির কুটীরে বসবাস করতেন না। তারা যে সমস্ত প্রাসাদ এবং দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং যেগুলি তাদের বাসস্থান ছিল, পরবর্তীকালে বহিরাগত মুসলিম শাসকরা তাদের কিছু সংস্কার করে তাকে ইসলামী ঢং বা আকারে নিয়ে এসে নিজেদের নির্মিত সৌধ বলে চালিয়েছেন। অবশ্য তারা চালিয়েছেন একথা বলা যাবে না কারণ তাদের সময়কার ঐতিহাসিকরা ঐ সব প্রাচীন হিন্দু সৌধগুলির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন এবং তাদের নাম ও তাদের প্রণীত গ্রন্থের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আমাদের দেশের পরবর্তীকালে মার্কস মেকলে পন্থীরা মুসলিম তোষণের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে — ১১৯২ পূর্ব হিন্দু সম্রাটদের কীর্তিগুলিকে বহিরাগত মুসলিম শাসকদের নির্মাণ বলে চালিয়েছেন। এ বাবদে তারা এতটাই কট্টর ছিলেন যে — মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলিকেও অগ্রাহ্য করেছেন।

দুটি অতি সাধারণ যুক্তি তাদের এই মুসলিম তোষণের উদ্দেশ্যে ইতিহাস বিকৃতির কাজকে বিদ্রুপ করে।

প্রথমতঃ — তাদের জবাব দিতে হবে যে দিল্লী আগ্রার সবই যদি বহিরাগত মুসলিম শাসকরা নির্মাণ করেছিলেন তাহলে পৃথ্বিরাজ চৌহান বা পূর্ববর্তী হিন্দু শাসকদের বাসভবনগুলি কোথায় গেল ?

দ্বিতীয়ত : — তাদের জবাব দিতে হবে বহিরাগত যে মুসলিম শাসকরা এইসব সৌধ নির্মাণ করেছিলেন — তাদের নিজেদের দেশে এইরকম কোন সৌধের অস্তিত্ব ছিল বা আছে কি ? বিদেশ থেকে যে মিস্ত্রীরা এসে লালকিলা, আগ্রার দুর্গ, তাজমহল বা ইৎমৎদৌলা বানালেন তারা তাদের নিজেদের দেশে এই রকম কোন সৌধ নির্মাণ করেছেন কি ? করে থাকলে সেই সব দেশে সেই সব সৌধ কোথায় গেল ? সেগুলির নাম কী ?

এই দুটি অতি সাধারণ প্রশ্নের কোন জবাব এই ইতিহাস বিকৃতকারীরা দিতে পারবেন না। ঠিক একইভাবে তাদের নিরুত্তর থাকতে হয়েছিল- আর্য আক্রমণ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও। আর্য আক্রমণ তত্ত্বে বলা হয় — আর্যরা বিদেশ থেকে এসেছিল — তবে বেদ নামক বিশাল গ্রন্থরাজি তাদেরই প্রণীত। তারাই মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। এই তাত্ত্বিকদের যখন প্রশ্ন করা যায়, যে আর্যরা বেদগ্রন্থরাজী প্রণয়ন করলেন তাদের ইতিহাস কোথায় আবার যে সিন্ধু সভ্যতার কথা বলা হয় তাদের সাহিত্য কোথায় ? তখন এরা উত্তর দিতে পারেন না। আর্য নামে এক জাতি পাওয়া গেল যাদের সাহিত্য আছে, ইতিহাস নেই। আবার সিন্ধু সভ্যতার যুগের ইতিহাস পাওয়া গেল সাহিত্য নাই।

মার্কস মেকলে পন্থী আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই ভাবেই ইতিহাস বিকৃত করেছেন এবং আজও সেই বিকৃত ইতিহাস আমাদের স্কুল কলেজের পাঠ্য।

আমরা এই প্রবন্ধের আগের অংশে দেখেছি যে মহম্মদ ঘোরী বা বহিরাগত মুসলিম শাসকরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করার আগেই লালকিল্লার অস্তিত্ব ছিল এবং তা মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচিত ইতিহাস থেকেই জানতে পারা যায়। সৌধটি পরবর্তীকালে ইসলামী ঢং-এ সংস্কার করা হয় এবং মুসলমান শাসক নির্মিত বলে প্রচার করে ইতিহাস বিকৃত করা হয়।

ঠিক একই কথা আগ্রা দুর্গ সম্পর্কেও বলা হয়। শুধু সৌধ বা ভবনের ক্ষেত্রেই যে এই ইতিহাস বিকৃতি সীমাবদ্ধ তা নয়। মুসলিম শাসকদের ব্যক্তি চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব ও বিকৃত করা হয়েছে। চরম অত্যাচারী শাসককে মহান করা হয়েছে, চূড়ান্ত প্রজাপীড়ককে দেখানো হয়েছে দরদী শাসক রূপে। এই ঘটনা যে শুধু বিশেষ কোন নবাব বা সম্রাটের ক্ষেত্রে করা হয়েছে তাই নয় — মহম্মদ বিন কাসেমের ভারত আক্রমণের সময় (৭১১-১২ খৃ.) থেকে দিল্লীর শেষ সম্রাট পর্যন্ত এক হাজার বছর ধরে প্রত্যেক শাসক সম্পর্কেই ঘটেছে ইতিহাস বিকৃতি, কাল্পনিক চরিত্র চিত্রণ। মুসলিম ঐতিহাসিকরা নিজেদের বাদশাহ, জাঁহাপনা, আলমপনাদের যে চিত্র অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে এঁকেছেন — তার বিপরীত ও বিকৃত চিত্র এঁকেছেন মার্কস মেকলে পন্থী ভারতীয় ইতিহাস লেখকরা। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এবং ভ্রমণকারীরা যে বিবরণ দিয়েছেন মার্কস মেকলে পন্থীরা তারাও কোন মূল্য দেননি।

যেমন ভিনসেন্ট স্মিথ তার ইতিহাস বইতে লিখেছেন যে শাজাহানের যুগকে কোনও ভাবেই মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা যায় না কারণ শাজাহানের সময় প্রায় প্রতি বছর দুর্ভিক্ষ হত। রাজকোষ শূন্য হয়ে গেছিল। তিনি ভূমি রাজস্ব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ধর্মসহিষ্ণু ছিলেন না, ধর্মীয় গোঁড়ামীর পরিচয় দেন (অর্থাৎ বেপেরোয়া হিন্দু নিধন ও মন্দির ধ্বংস করেন) ইত্যাদি। অথচ সেই শাজাহানকে আমাদের ইতিহাসকাররা মহান, প্রেমিক, প্রজাবৎসল, ধর্মনিরপেক্ষ ইত্যাদি বলে প্রচার করলেন — আর তার ৩০ বছরের রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগ বলা হল। সম্ভবত এই কারণেই যে তিনি লালকেল্লা ও তাজমহল নির্মাণ করান। যদিও প্রকৃতি ইতিহাস বলছে তিনি কোনটাই নির্মাণ করেন নি এবং তিনি খুব আদর্শ প্রেমিক ছিলেন এমনও নয়। তার বাবাই তাকে শয়তান বলে অভিহিত করেছিলেন।

১১৯২ খৃষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে রাজপুত সম্রাট মহারানা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী দখল করলেন। সেই বছরই ঘোরী আজমীর বা অজয় মেরু দুর্গ দখল করেন। ভারতের বিজিত অঞ্চলগুলি ক্রীতদাস তথা সেনাপতি কুতুবউদ্দীনকে দিয়ে তিনি গজনী চলে যান। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।

এই কুতুবুদ্দীনই নাকি দিল্লীর কুতুবমিনার নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন। কুতুবুদ্দীন গজনীর লোক। সুলতান মামুদ এবং মহম্মদ ঘোরী এরাও গজনীর। কিন্তু গজনীতে এই ধরণের স্থাপত্যের কী নির্দশন আছে ?

কুতুবমিনার নামে দিল্লী শহরের নিকট যে মিনারটি প্রত্যেক ভ্রমণার্থীর অবশ্য গন্তব্য সেই মিনার কি সত্যিই কুতুবুদ্দীনের তৈরী ?

ভারতবর্ষকে ইসলামী দেশ বানানোর উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ শুরু হয় ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে খলিফা উমরের (৬৩৪-৬৪৪) সময়ে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী খলিফা ওসমান (৬৪৬-৬৫৬) গতবারের আক্রমণে যে শিক্ষা পাওয়া গেছিল - সেই অভিজ্ঞতায় ভারত আক্রমণের কোন চেষ্টা করেন নি। পরবর্তী খলিফা আলী (৬৫৬-৬৬১) ৬৫৯-৬৬০ খৃষ্টাব্দে স্থলপথে এক দলকে পাঠান। কিন্তু ৬৬২ তে সেই আক্রমণকারী দলের নেতা সহ সকলেই কিকানে (সিন্ধু প্রদেশে খোরাসান এলাকায়) নিহত হন। মোয়াবিয়া যখন খলিফা হলেন (৬৬১-৬৮০) ছয়বার ভারত অভিযানের ব্যবস্থা করেন ৬৮০ খৃষ্টাব্দে মকরাম দখল করে তারা। পরবর্তী ২৮ বছরে আর কোন ভারত অভিযান হয়নি। আবার ৭০৮ খৃষ্টাব্দে দেবল (করাচী) দখলের অভিযান হয়। দুই সেনাপতি ওবায়েদ উল্লহ্ এবং বুদাইল নিহত হন।

ইরাকের শাসক হিজ্জাজ চার বছর ধরে ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। ৭১২ খৃষ্টাব্দে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র তথা জামাতা মহম্মদ বিন কাসেমকে ভারত অভিযানে পাঠান। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু ও মুলতান দখল করেন।

এইভাবে আরব আক্রমণকারীদের ভারতের মাটিতে দখল নিতে প্রায় ৭০-৭৫ বছর লেগে যায়। যে ভারতীয় বীররা এই দীর্ঘকাল ধরে বিদেশী আক্রমণ ঠেকিয়ে আসছিলেন তাদের ইতিহাস আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই। এমনকি এই ৭০-৭৫ বছরের প্রচেষ্টায় খবরও আমাদের ইতিহাস বইতে লেখে না।

ড. রামগোপাল মিশ্র তার রচিত Indian Resistance to Early Muslim up to 1206 নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। (Anu Books, Sivaji Road, Meerat City বইটি প্রকাশ করেছেন)।

তিনি লিখেছেন যে ইসলামী বাহিনী কত সহজে সিরিয়ান, পার্সিয়ান, টার্ক এবং অন্যান্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির ইসলামায়ন করেছে — বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতিতে কত অল্প সময়ে আরবায়িত করেছে। (পৃ. ৩ ঐ পুস্তকে)। অথচ সেই আরব বাহিনীর ভারতে পা রাখতে ৬৯ বছর লেগে গেল। পরবর্তী ৩০০ বছর তারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন স্থান দখল করলেও আরবায়িত করতে পারেনি। আমাদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে এই সব বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, অনুপস্থিত। আরব আক্রমণকারীদের বীরত্ব গাথা সম্পূর্ণ ইতিহাস দখল করেছে।

ড. রামগোপাল মিশ্র প্রণীত ঐ পুস্তকে ৮টি অধ্যায় আছে। তার মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি বহু সংস্কৃত শিলালিপির ইংরাজী ভাষান্তর রেখেছেন। ঐ শিলালিপিগুলি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে — হরিয়ানা থেকে গৌহাটি বদায়ুন থেকে নাগপুর। এই শিলালিপিগুলিতে এমন সব ইতিহাস আছে যা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে কখনও আনা হয়নি।

১১৯১ তে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বিরাজের কাছে পরাজিত হলেও ১১৯২ তে জয়ী হন। তিনি কুতুবুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে রাজা জয়চাঁদের বিরুদ্ধে ১১৯৪ সালে অভিযান করেন। এই প্রসঙ্গে হাসান নিজাম তার প্রণীত ইতিহাস গ্রন্থ - তাজ-উল-মাসিরে যা লিখেছেন ইলিয়ট এবং ডসনের বইতে তার অনুবাদ আছে। হাসান নিজাম লিখেছেন - 'তার তরবারীর ধার সমস্ত হিন্দুকে নরকের আগুন নিক্ষেপ করল। তাদের কাটা মুণ্ড দিয়ে আকাশ সমান উঁচু তিনখানা গম্বুজ নির্মাণ করা হল এবং কবন্ধগুলি বন্য পশুর খাদ্যে পরিণত হল (ইলিয়ট ও ডসন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯৮)। সেই একই ঘটনা আর এক ঐতিহাসিক মিনহাজ তার তাবাকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন - সেনাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা ইসলাম গ্রহণ করল, আর যারা সনাতন ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করল তাদের সবাইকে হত্যা করা হল (ইলিয়ট ও ডসন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২২)। কাশী নগরী দখল করার পর কুতুবুদ্দীন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার আদেশ দিলেন। মিনহাজ তার পুস্তকে লিখেছেন — তারা প্রায় এক হাজার মন্দির ধ্বংস করল এবং সেইসব মন্দিরের ভিতের উপর মসজিদ নির্মাণ করল (ইলিয়ট ও ডসন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৩)।

কাশী থেকে কুতুব গেলেন আজমীর বা অজয় মেরু। মিনহাজ তার তাবাকাৎ-ই-নাসিরীতে লিখেছেন — "সেখানে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল, বিদ্রোহের পথ বন্ধ হল, বিধর্মী কাফেরদের প্রাধান্য রুদ্ধ হল এবং মূর্তি পূজার সমস্ত প্রতিষ্ঠান নির্মম ভাবে ধ্বংস করা হল" (ইলিয়ট ও ডসন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২২৭)।

এরপর ১১৯৬তে কুতুব গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করলেন। মিনহাজ তার ঐ পুস্তকে লিখেছেন — "পবিত্র ধর্মযুদ্ধের বাণী অনুসরণ করে তারা তাদের রক্ত পিপাসু

তরবারি খাপ থেকে বার করে ধর্মের শত্রুদের সামনে তুলে ধরল।" হাসান নিজামী একই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তার বই তাজ-উল-মাসিরে — "ইসলামের সেনারা সম্পূর্ণরূপে বিজয়ী হল এবং এক লক্ষ কাফের হিন্দুদের তৎক্ষণাৎ নরকের আগুনে পাঠিয়ে দেওয়া হল — মূর্তি পূজার সমস্ত কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করল এবং সেখানে ইসলামের নিদর্শন স্বরূপ মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করল।" (ইলিয়ট ও ডসন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৫)

১১৯৭ তে কুতুব এর গুজরাট অভিযান। মাউন্ট আবুর এক গিরিপথে রাজা করণ সিং ও ইসলাম বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। রাজা করণ সিং পরাজিত হলেন। মিনহাজ লিখেছেন — "প্রায় ৫০ হাজার বিধর্মী কাফেরকে তরবারীর সাহায্যে নরকের আগুনে চালান করা হল। তাদের শবদেহের স্তুপ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে গেল। ২০ হাজারেরও বেশী ক্রীতদাস, কুড়িটি হাতিসহ এত লুঠের মাল বিজয়ীদের হাতে এল, যা কেউ কল্পনাও করেনি। (ইলিয়ট ও ডসন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩০)

১২০২ তে কুতুব আক্রমন করেন কালিঞ্জর দুর্গ। এবার সঙ্গে ক্রীতদাস আলতামাস বা ইলতুতমিস। রাজা অজদেওর সঙ্গে ইসলাম বাহিনীর যুদ্ধ হল। মিনহাজ লিখেছেন — "সমস্ত মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হল। ৫০ হাজার হিন্দুকে ক্রীতদাস হিসাবে পাওয়া গেল এবং হিন্দুর রক্তে মাটি পীচের মত কালো হয়ে গেল। (ইলিয়ট ও ডসন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩১)

কুতুবউদ্দীনের বর্বরতার আরও ইতিহাস আছে। সবটুকু উল্লেখ করতে হলে পৃথক পুস্তক রচনা করতে হয়। এইটুকু উল্লেখ করলাম এই কারণে যে যার বা যাদের বর্বরতা এই সীমায় তাদের ভিতরে কি শিল্পানুরাগ থাকা সম্ভব ? বিশেষ করে তারা যে দেশ থেকে ভারতের এসেছিলেন সে সব দেশে এই ধরণের শিল্পের যখন কোন নিদর্শন নাই?

বলা হয়ে থাকে আমাদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে লিখিত আছে যে কুতুব উদ্দীন আইবক কুতুবমিনার তৈরী শুরু করেন এবং তার একদা ক্রীতদাস পরে সুলতান আলতামাস তা সম্পূর্ণ করেন। আলতামাস প্রথম থেকেই কুতুবের ক্রীতদাস ছিলেন না। অনেকের হাত ধরে কুতুবের হাতে আসেন। গজনীর বাজারে কুতুব তাকে কিনতে পারেন নি। দিল্লীতে এনে তবে তাকে ক্রয় করার ব্যবস্থা করেন কুতুব। এক হাজার দীনার মূল্য দিতে হয়েছিল বিক্রেতা জামালুদ্দিনকে। মহম্মদ ঘোরী যে কারণে ক্রীতদাস কুতুবের ভক্ত হয়ে পড়েন ঠিক সেই কারণে কুতুবও ক্রীতদাস আলতামাসের ভক্ত হয়ে যান। (এ সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে ইলিয়ট ও ডসনের ঐ বইর দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৩২০ পড়ুন)। আমাদের ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে, কুতুবউদ্দীন আইবক দিল্লীর শাসন কর্তা হিসাবে ১১৯৬ সাল দিল্লী আসেন এবং ১২০৬ সালে কুতুবমিনার নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ১২১০ সালে তার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর আগে মাত্র একতলা পর্যন্ত তৈরী করতে সক্ষম হন। তার মৃত্যুর পর তার জামাতা আলতামাস বা ইলতুৎমিস এই মিনারের কাজ শেষ করেন। মূল নকশা অনুযায়ী তা ২২৫ ফুট উঁচু এবং চারটি তলায় ভাগ করা হয়। (The History & Culture of the Indian People R. C. Mazumdar, Vo. VI, Page-668)

মুসলমানরা যে মিনার তৈরী করেছেন তার প্রমাণ হিসাবে জন মার্শাল Monuments of Muslim India গ্রন্থে লিখেছেন — "মূল পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এই মিনারের গঠন ও অলংকরণ সর্বাংশে ইসলামী। মসজিদে আজান দেবার জন্যই হোক, আর গজনীর মিনারের মত স্বতন্ত্র এক মিনারই হক, একমাত্র মুসলমানেরাই এই ধরণের মিনারের সঙ্গে পরিচিত ছিল। হিন্দুদের কাছে এ ধরণের মিনার ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। (ইলিয়ট ও ডসন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৬৯)

কিন্তু জন মার্শালের দেশের আর এক পণ্ডিত আর্থার উপহাম পোপ বলেন, পশ্চিম এশিয়ার কোন নিজস্ব স্থাপত্য শৈলী নেই। যেসব স্থাপত্য শৈলী তারা নিজেদের বলে দাবী করে, তা সবই একসময় ভারত থেকে নিয়েছে। (ইলিয়ট ও ডসন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৬৯)

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক এস. কে. সরস্বতী লিখছেন — "বাস্তবিক পক্ষে কৌণিক খিলান, অষ্টকোণ যুক্ত সৌধ এবং গম্বুজ ইত্যাদি ভারতের হিন্দু স্থপতিরাই আবিষ্কার করেন, কিন্তু তা আজ ইরানী স্থাপত্য নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে শিল্পের আদান-প্রদান, ইসলাম অভ্যুদয়ের অনেক আগেই, স্থাপত্য কলা ভারত থেকে পশ্চিমে চলে যায়, যার উপরে কোন প্রভাব ফেলা ইসলামের পক্ষে ছিল নিতান্তই অসম্ভব। (ইলিয়ট ও ডসন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৬১)

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী তার মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রী পুস্তকে লিখেছেন — "এখানে উল্লেখ করার বিষয় হল, যেই দেশে ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছে, সেই আরব দেশের নিজস্ব কোন স্থাপত্য শৈলী নেই। পরবর্তীকালে আরবরা যখন ইরান, ইরাক ও তুরস্ক জয় করল তখন সেই সব বিজিত দেশের সাবেক স্থাপত্য শৈলীই ইসলামী স্থাপত্য শৈলী বলে নাম পেল এবং আর্থার উপহামের মতে ইরান, ইরাক ও তুরস্কের সাবেক স্থাপত্য শৈলীর জননী হল হিন্দু স্থাপত্য। (ইলিয়ট ও ডসন, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৫)

গজনীর মিনারের সঙ্গে কুতুব মিনারের সাদৃশ্য দেখে জন মার্শাল যে মন্তব্য করেছেন তা প্রশ্নাতীত নয়। গজনীর মিনার যে মুসলমানদের তৈরী তার কোন প্রমাণ নাই। গজনীর মিনার প্রাক্ ইসলাম যুগের তৈরী হওয়া সম্ভব এবং সেই কারণে তার স্থাপত্য শৈলীও নির্ভেজাল হিন্দু। গজনীর মিনারের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দ্বারাই এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে কৌতূহলী পাঠকরা India's Contribution to world thought & culture, (Vivekananda Rock Memorial Com. 12 Pilaiyar Koil Street, Triplicane, Madras - 5) পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ পড়ে দেখতে পারেন।

(এই বইটি ১৯৭০ সালে সম্পাদিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় বিশেষজ্ঞরা এক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এছাড়া বিদেশী পণ্ডিতদের প্রবন্ধও আছে। বহু ছবি দিয়ে প্রবন্ধগুলিকে প্রামাণ্য করা হয়েছে। এই বইটি এখন out of print। কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজ লাইব্রেরীতে এই পুস্তক একখণ্ড ছিল অন্ততঃ ১৯৯১ পর্যন্ত। এখনও থাকতে

পারে।) দিল্লীর যে এলাকায় কুতুব মিনার অবস্থিত সেই জায়গাটির নাম মেহেরৌলি। 'মেহেরৌলি' শব্দটি এসেছে 'মিহিরওয়ালি' থেকে। মিহির হলেন সম্রাট বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১৩ খৃ.) রাজসভার নবরত্নের এক রত্ন। বরাহমিহির ছিলেন জ্যোর্তিবিদ। মিহিরওয়ালি বলতে বোঝায় বরাহ মিহিরের শিষ্য বা অনুগামীগণ। (ড. ব্রহ্মাচারী পৃ. ৬২)

আজ যেখানে কুতুব মিনার দাঁড়িয়ে আছে, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার চারপাশে অনেক বিধ্বস্ত দালান কোঠা রয়েছে। ড. ব্রহ্মাচারী লিখেছেন — পুরো অঞ্চলটা এককালে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার ও গবেষণার কেন্দ্র ছিল এবং বরাহমিহিরের অনুগামীরা সেখানে পঠন-পাঠন ও গবেষণাগার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এবং আজকার কুতুব মিনার ছিল পর্যবেক্ষণ স্তম্ভ বা Observation Tower।

বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যার বিখ্যাত গ্রন্থ - 'পক্ষ সিদ্ধান্তিকা'র প্রণেতা। তিনি সংস্কৃত অহোরাত্র শব্দের 'অ' এবং 'এ' বাদ দিয়ে 'হোরা' নামে সময়ের একটি নূতন একক সৃষ্টি করেন এবং ২৪ হোরায় ১ দিন রাত্রি অহোরাত্র মাপা চালু করেন। এই 'হোরা' থেকে ইংরাজী 'আওয়ার' শব্দের সৃষ্টি হতে পারে। বরাহ মিহিরকে অনুসরণ করেই আজ সারা বিশ্ব ২৪ ঘন্টায় (Hour) দিনরাত্রি করছেন।

ড. ব্রহ্মাচারী আরও লিখেছেন যে, সাবেক অবস্থায় কুতুব মিনারের চারিদিকে ২৭টি নক্ষত্রের নামে ২৭টি মন্দির ছিল। এছাড়া প্রায় আধ মাইল দূরে আরও একটি মন্দির ছিল। ২৭টি নক্ষত্র হল — অশ্বিনী, ভরনী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, মঘা, অশ্লেষা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, স্বাতী, চিত্রা, বিশাখা, অনুরাধা জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বষাঢ়া, উত্তরষাঢ়া, অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদ এবং উত্তর ভাদ্রপদ। এদের সঙ্গে ধ্রুবতারা যোগ করলে ২৮ নক্ষত্র হয়।

সুলতান হয়ে দিল্লীতে পা দিয়েই কুতুবউদ্দীন বুতপরস্তির পরাকাষ্ঠা মন্দিরগুলি ধ্বংস করেন। ইতিপূর্বেই তার মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানানোর কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছি। নিয়মমত ভাঙ্গা মন্দিরের মাল মশলা দিয়ে নিকটেই 'কুতুব-উল-ইসলাম' মসজিদ তৈরী করেন। এই মসজিদের গায়ে কুতুব উদ্দীনের যে শিলালিপি আছে, তাতে এই সব ঘটনার কথা লেখা আছে। প্রধান ফটক থেকে চন্দ্ররাজার লৌহস্তম্ভে যাওয়ার পথে যে বড় কৌণিক খিলান আছে, তার গায়ে একটা শিলালিপিতে এসব ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। [The History and culture of Indian Peoples, R. C. Mazumder]

John Marshall এবং আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে, নামাজের আগে আজান দেওয়ার জন্যই কুতুবউদ্দীন ঐ মিনার তৈরী করেছেন। এ বক্তব্যের কোন সঙ্গতি নাই। কারণ মসজিদ থেকে মিনারের যে দূরত্ব আজান দেওয়ার জন্য এতদূরে কোন মিনার কেউ তৈরী করেন না। আজানের মিনার মসজিদ সংলগ্নই থাকে। দ্বিতীয়তঃ কুতুব মসজিদ বানিয়ে ছিলেন, কিন্তু মিনার নির্মাণ শেষ করতে পারেন নি। অতএব আজানের জন্য মিনার এই যুক্তি টেকে না। তৃতীয়তঃ মসজিদের থেকে মিনার অনেক মূল্যবান ও আকর্ষণীয় হয় না। কুতুব উল ইসলাম মসজিদ ও কুতুব মিনার এর মধ্যে শেষোক্তটি অনেক আকর্ষণীয় ও মূল্যবান।

কুতুব মিনার - একটি আরবী শব্দ যার বাংলা 'মেরু স্তম্ভ' বা বিশেষ অর্থে উত্তর মেরু স্তম্ভ। কুতুব উদ্দীনের সঙ্গে এই মিনার বা স্তম্ভের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হল — কুতুব উদ্দীনের এতবড় কীর্তির কথা তার সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আমরা হাসান নিজামীর লেখা তাজ উল মাসির এবং মিনহাজ উস সিরাজের লেখা তাবাকাৎ-ই-নাসিরির উল্লেখ করেছি। কুতুব উদ্দীন যে কোথাও কোন মিনার তৈরী করেছেন - তা এই দুই ইতিহাস গ্রন্থে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। তার মন্দির ভাঙ্গা এং মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরীর বহু ঘটনাই এই সমসায়িক দুটি ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া গেলেও এই মিনার নির্মাণের কোন উল্লেখ নাই।

অথচ এতকাল ধরে আমাদের পাঠ্য ইতিহাস বইগুলিতে কত সহজেই না কুতুব উদ্দীনের কুতুব মিনারের কথা লেখা হয়ে আসছে, পঠিত হয়ে আসছে এবং সে কারণে বিশ্বাসও করা হচ্ছে।

কুতুব উদ্দীনের নামের সঙ্গে এই মিনার জুড়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে কুতুব উদ্দীন মারা যাওয়ার ২০০ বছর পরে। শাসম-ই-সিরাজ নামক এক মুসলিম লিপিকার এই কাণ্ডটি ঘটান।

(Islamic havoc in Indian History P.N. Oak, Pub. : A. Ghosh 5740 W. Little York, Houston, Texas, U.S.A. Page-120)

কুতুব উদ্দীন আইবক দিল্লীতে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা। জাতিতে তুর্কী। নৈশপুর এর ক্রীতদাসের হাট থেকে এক কাজী তাকে প্রথমে ক্রয় করেন। কাজীর নাম ছিল ফকরুদ্দীন আবদুল আজিজ। একটু বড় হলে এক বণিক তাকে গজনীতে নিয়ে আসে। মহম্মদ ঘোরী তাকে কিনে নেন। কুতুব উদ্দীনের চেহারা ও শারীরিক গঠন ছিল খুবই সুন্দর, কিন্তু হাতের একটি আঙ্গুল ভাঙ্গা ছিল — তাই 'আইবক' বলা হত। 'আইবক' শব্দের অর্থ হল — শারীরিক খুঁত যুক্ত ব্যক্তি। মহম্মদ ঘোরী কুতুবউদ্দীনের খুবই বাধ্য ছিলেন। তিনি তাকে আস্তাবলের প্রধান রক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। ফলে ঘোরীর সমস্ত অভিযানেই কুতুব সঙ্গে থাকতেন।

মিনহাজ-উস্-সিরাজ তার তাবাকাৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে লিখেছেন — "সুলতান কুতুবউদ্দীন ছিলেন দ্বিতীয় এক হাতিমতাই - একজন সাহসী ও উদার নরপতি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে দিয়েছিলেন অকৃপণ সাহস ও বদান্যতা। ফলে সেই সময়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে তার মত কোন সুলতান ছিল না। কুতুবউদ্দীন হিন্দুস্তানকে বন্ধুতে (মুসলমান) পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং শত্রু (হিন্দু) শূন্য করেছিলেন। His bounty was continuous, his slaughter was continuous অর্থাৎ বিরামহীন লুটপাট ও হত্যা চালিয়েছিলেন তিনি। (Elliot & Dowson Vol-II, Page 298) কুতুব মিনারের গায়ে বিক্রম সম্বৎ (১১৪৭ খৃ.) খোদিত একটি শিলালিপি আছে। এটি নাগরী ভাষায় লেখা। এই শিলালিপি কুতুব মিনারের অবিচ্ছেদ্য অংশ ধরে নিলে বলতে হয় মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করার আগেও কুতুব মিনার ঐখানে ছিল। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকদের মত হল, পুরানো অনেক মন্দির ইমারৎ

ভেঙ্গে কুতুব মিনারের মাল মশলা যোগাড় করা হয়েছিল। ঐ শিলালিপি সেই সব মাল মশলার সঙ্গে চলে এসেছে।

আচার্য বাপু বানকর জানাচ্ছেন যে, গত ১৯৭৪ সালে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর থেকে প্রকাশিত এবং পণ্ডিত কেদারনাথ প্রভাকর দ্বারা সম্পাদিত 'বরাহ মিহির স্মৃতিগ্রন্থ' নামক পুস্তকে কুতুবমিনারের প্রকৃত পরিচয় এবং আরও অনেক তথ্য নিহিত আছে। ঐ পুস্তকের ১২৭ পৃষ্ঠায় ঐ শিলালিপির উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে ১১৪৭ সালে মেরুস্তম্ভের সংস্কার করা হয়েছিল। যেসব রাজপুত কারিগর ঐ সংস্কারের কাজ করেছে শিলালিপিতে তাদের নামও আছে। অতএব অনুমান করা যায় — অন্য কোন মন্দির বা ইমারৎ ভেঙ্গে মাল মশলার সঙ্গে ঐ শিলালিপি আসেনি। উক্ত গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ঐ স্তম্ভ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মাণ করেন। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল (৩৮০-৪১৩ খৃ.)। সম্রাট বিক্রমাদিত্য নির্মিত যে লৌহস্তম্ভটি কুতুব মিনারের পাশে আছে, তার গায়ে সংস্কৃত ও ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা একটা লিপি আছে। ঐ লিপিতে কুতুব মিনারকে বলা হয়েছে 'প্রপাংশু বিষ্ণুধ্বজ'।

উক্ত বরাহমিহির স্মৃতিগ্রন্থের ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে মেরুস্তম্ভটি (কুতুব মিনার) স্বয়ং বরাহ মিহির তত্ত্বাবধানে রাজপুত কারিগররা নির্মাণ করেন। 'মিহিরাবলি' বলে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। ঐ সুবিশাল আশ্রম ২৭ নক্ষত্রের মন্দির থেকে কালকাদেবীর মন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

২৭ নক্ষত্রের মন্দির এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্তম্ভের পশ্চিমে ছোট্ট একটি টিলার উপর কালকাদেবী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। বর্তমানে 'সুরজ কি ঠিকরি' নামে পরিচিত।

(ড. ব্রহ্মচারীর ঐ পুস্তক। পৃ. ৭৫)

বরাহমিহির স্মৃতিগ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে সম্রাট বিক্রমাদিত্য তৎকালীন গান্ধার দেশে (বর্তমান আফগানিস্তান) অনুরূপ একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তার নাম ছিল 'বেধ মেরু'। বর্তমানে ঐ স্তম্ভ আফগানিস্তানে 'মিনার-ই-জাম' নামে পরিচিত।

(ড. ব্রহ্মচারীর ঐ পুস্তক। পৃ. ৭৬)

বরাহমিহির স্মৃতিগ্রন্থে কেন ঐ স্তম্ভের উচ্চতা ২২৫ ফুট করা হয়েছিল তার আংকিক ব্যাখ্যা আছে যা জ্যোতির্বিদ্যার বিষয় বলে আমরা তার উল্লেখ করলাম না।

আচার্য্য বাপু বানকর তার ইতিহাস দর্শন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে — বরাহমিহির স্মৃতি গ্রন্থ ছাড়াও পণ্ডিত কমলা প্রসাদ মণি পাটনা থেকে 'শ্রীমিহিরাচার্য বংশাবলী' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ঐ গ্রন্থে কুতুব মিনার সংক্রান্ত আরও অনেক তথ্য আছে।

একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে ভারতে মুসলিম আক্রমণের ৮০০ বছর আগেই কুতুব মিনারের (মেরুস্তম্ভ) অস্তিত্ব ছিল এবং তা বরাহমিহিরের জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্র ছিল। মেহেরৌলি মিহিরাবলীর ইসলামায়িত নামকরণ - যেমন মেরুস্তম্ভের নাম হয়েছে কুতুব মিনার এর অপভ্রংশ কুতুব মিনার। কুতুব মিনার প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে সমসাময়িক মুসলিম ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে কুতুবউদ্দীনের কুতুব মিনার নির্মাণের কোন উল্লেখ নাই।

কুতুবের মৃত্যুর ২০০ বছর পরে — কুতুবউদ্দীনের নামের সঙ্গে কুতুব মিনার জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বাবদে মুসলিম ঐতিহাসিক হাসান নাজামীর তাজ-উল-মাসির নামক গ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক মিনহাজ্-উস্-সিরাজ এর তাবাকাৎ-ই-নাসিরি নামক গ্রন্থের উল্লেখ করছি।

বিস্ময়ের বিষয় আমরা দেখব যে, শাজাহানের সমসাময়িক এত ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে কেবলমাত্র একটিতে (বাদশানামা — আবদুল হামিদ লাহোরী প্রণীত) ব্যতীত আর কোথাও তাজমহলের উল্লেখ নাই। এবং লাহোরী প্রণীত বাদশানামায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সম্রাট শাহ্‌জাহানকে তাজমহল নির্মাণের কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। বরং তাজমহল যে শাহ্‌জাহান নির্মাণ করেন নি — তাই-ই প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে পরে বিস্তৃত আলোচনা করার পরিকল্পনা আছে।

এখন আমরা বিখ্যাত আগ্রা দুর্গ নিয়ে আলোচনা করব। এ বিষয়ে ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী তার পুস্তকে বিস্তৃত ও প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন। আমি মূলতঃ তার পুস্তকের খেই ধরেই বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব।

আমাদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে আছে যে — আগ্রা দুর্গ নামে এখন আমরা যেটা দেখি আগ্রা বেড়াতে গিয়ে, সেটি সম্রাট আকবরের তৈরি।

এক মুসলিম ঐতিহাসিক নিজামুদ্দীন আহম্মদ তার প্রণীত পুস্তক তাবাকাৎ-ই-আকবরীতে লিখেছেন যে আকবর আগ্রায় নতুন একটি দুর্গ নির্মাণের আদেশ দেন এবং তা চার বছরে নির্মিত হয়। আবুল ফজল যিনি আকবরের সভাসদ ছিলেন, তিনি জানাচ্ছেন আকবর ৮ বছরের মধ্যে আগ্রায় দুর্গ নির্মাণ করেন। আবার জাহাঙ্গীর এর কথায় আগ্রা দুর্গ নির্মাণে ১৫ বছর লেগেছিল।

আগ্রা দুর্গ নির্মাণ করতে কত সময় লেগেছিল এ বিষয়ে যেমন ঐতিহাসিকরা একমত নন, ঠিক তেমনি তাজমহল তৈরী হতে কত বছর লেগেছিল সে ব্যাপারেও ঐতিহাসিকরা একমত নন। তাজমহল নির্মাণে কত ব্যয় হয়েছিল — এ নিয়েও কোন সঠিক হিসাব কোথাও পাওয়া যায় না। তাজমহল নির্মাণে কত সময় লেগেছিল এ নিয়ে ৫ জনের ৫ রকম হিসাব আছে এমন কি কবে তাজমহল নির্মিত হয় তা নিয়েও সময়ের হিসাব ঠিক নাই।

এই প্রসঙ্গ তুললাম এই কারণে যে এরা সত্যিই নতুন কিছু বানালে কোন না কোন ঐতিহাসিক বা সকলে একটি সময়ের হিসাব দিতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকবর যেমন আগ্রা দুর্গ নির্মাণ করেন নি, শাজাহানও তেমনি লালকিল্লা বা তাজমহল নির্মাণ করেননি। এরা কিছু হিন্দু প্রাসাদ বা দুর্গকে সংস্কার করেছেন — ইসলামী আদল দিয়েছেন। আগ্রায় যদি কোন দুর্গ না ছিল তবে রাজা জয়পাল কোথায় থাকতেন ?

মুসলিম লিপিকার আবদুল্লা তার প্রণীত তারিখ-ই-দাউদিতে লিখেছেন — গজনীর মামুদ আগ্রা আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেন। মামুদের প্রায় ৫০০ বছর পরে আকবর।

ইলিয়ট ও ডসনের বইর চতুর্থ খণ্ডের ৫২২-৫২৩ পৃষ্ঠায় কোন এক সলমন লিখিত একটি ইতিহাসের উল্লেখ আছে। তাতে বলা হয়েছে — আগ্রায় দুর্গ যেন বালির মধ্যে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে এবং তার প্রাকার যেন দুর্ভেদ্য টিলা। এই ইতিহাসে রাজা জয়পালের উল্লেখ আছে। জয়পাল যখন আত্মসমর্পন করলেন ও প্রচুর ধন সম্পত্তি দেওয়ার কথা বললেন, তখন রাজার রাজা উত্তরে বললেন, "আমি এই দেশে ধর্মযুদ্ধ করতে এসেছি, আমি অনেক দুর্গ দেখেছি — যেগুলি আমার লোকেরা অধিকার করেছে। কিন্তু আমি এই রকমই একটি দুর্গ খোঁজ করছিলাম যা কেউ অধিকার করতে পারেনি। এখন এই আগ্রার দুর্গ আমি দেখতে পেলাম আমি একে ধ্বংস করব। অন্যান্যরা ধনসম্পত্তি চায় কিন্তু আমি শুধু সব কিছুর দাতা যিনি তার কাছে ক্ষমা চাই।" এবং যুদ্ধ শুরু হল — দুর্গের বাইরে ইসলামীরা আর ভেতরে কাফেররা। কয়েকদিন ধরে দিবারাত্রি যুদ্ধ চলল। রক্তের নদী বয়ে গেল ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত মামুদ দুর্গ দখল করলেন।

প্রশ্ন হল — আগ্রা যদি একটি গ্রামই হবে এবং আকবর যদি এই আগ্রা দুর্গ বানিয়ে থাকবেন তবে মামুদ কোন্ দুর্গ দখল করার জন্য কয়েকদিন দিবারাত্রি যুদ্ধ করলেন ? বালির মধ্যে পাহাড়ের মত কোন্ দুর্গ দাঁড়িয়েছিল ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আকবর যদি আগ্রা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন তাহলে তার পিতা হুমায়ুন কোন্ দুর্গ রক্ষা করেছিলেন আগ্রায় বাবরের হয়ে ? ইতিহাস বলছে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে বাবর আগ্রায় আসেন। তিনি যখন সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন তখন আগ্রা দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব হুমায়ুনকে দেওয়া হল। যে দুর্গ আকবর বানালেন ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৫২৬-৩০ খৃষ্টাব্দ সেই দুর্গ তার বাবা রক্ষা করলেন কী করে ?

আমাদের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা এই প্রশ্নের কী মীমাংসা করবেন ?

আর 'মহান' আকবর ? ইউরোপীয় ইতিহাসকার ভিনসেন্ট স্মিথের Akbar, The Great Mughal গ্রন্থটি পড়লেই আকবরের Great ত্বের পর্দা ফাঁস হয়ে যায়। আমাদের পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা এ বাবদে কোন্ সূত্র ধরে যে আকবরকে গ্রেট বানালেন তা আমার কাছে এক হেঁয়ালি। আকবরের সভাসদদের মধ্যে আবুল ফজল — আকবরের জীবনী লিখেছিলেন। আবুল ফজল ছিলেন আকবরের নির্লজ্জ চাটুকার 'Shamelsss flatterer' অবশ্য আকবরের নিষ্ঠুরতার সামনে তার সভাসদের চাটুকার বা স্তাবক হওয়া ব্যতীত উপায়ও ছিল না। যুদ্ধে পরাজিত, ক্ষত-বিক্ষত প্রায় অচেতন হিমুকেও যিনি নিজে তলোয়ার দিয়ে কোতল্ করতে পারেন, অভিভাবক বৈরাম খাঁকে মক্কার পথে পাঠিয়ে দিয়ে যিনি গুপ্তচর দিয়ে হত্যা করাতে পারেন তিনি কী করে Great হন — ভারতীয় মূল্যবোধে তার ব্যাখ্যা করা যায় না।

একটি বিস্ময়ের বিষয় সমস্ত ইতিহাস পাঠকদেরই নজরে আসা উচিত এবং হয়ত এসেও গেছে প্রখ্যাত সৌধ, ইমারৎ, মিনার প্রভৃতি নির্মাণের সন তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। কোন কোন বিষয় সমসাময়িক ইতিহাসে উল্লিখিত হয়নি, কোন বিষয় উল্লিখিত হলেও খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে নয়। অথচ আমাদের পাঠ্য ইতিহাস বইগুলিতে বিষয়গুলি

এমনভাবে রাখা হয়েছে যেন সেই ব্যক্তির চোখের সামনেই ঘটনা ঘটেছে। ইতিহাস বিকৃতির সেই সব চমকপ্রদ দিক উন্মোচোনের জন্যই আমার এই প্রয়াস।

একটা দেশকে পরাধীন রাখার জন্য প্রথম যে কাজটা করা দরকার হয় তা হল দেশবাসীকে হীনমন্য করে দেওয়া। আমাদের ইতিহাস পুস্তকের মাধ্যমে সেই কাজটি খুব সহজে করা হয়েছে এবং তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে যা আজও বিদ্যমান। ৬৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ইংরাজ শাসন চালু হওয়া পর্যন্ত প্রায় এক হাজার/এগার শত বছর ধরে ভারতের স্বভূমির মানুষরা কীভাবে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের কীভাবে বাধা দিয়েছেন, কোটি কোটি মানুষ কীভাবে বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েও ভারতীয় মূল্যবোধ ও স্বাভিমান রক্ষা করেচিলেন সে ইতিহাস যদি আমাদের পাঠ্যপুস্তকে থাকত তাহলে হয় ইংরাজরা আমাদের পরাধীন করতে পারত না আর যদি পারতও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেহারা হত অন্যরকম অনেক কম সময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতাম।

ইতিহাসের মাধ্যমে হীনমন্য করে দেওয়া কয়েক কোটি মানুষকে জাগরিত করে তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করানো ছিল কঠিন কাজ। **ভারতবর্ষ ২০০ বছর পরাধীন ছিল না, ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল এক হাজার দুশো (১২০০) বছর।**

এই হাজার বছরের পরাধীনতাকে ঢাকবার জন্য হাজার রকম মিথ্যা ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে — যাতে ভারতীয় ছাত্রদের স্বাভিমান পড়াশোনার মাধ্যমে জাগ্রত না হয়। এ এক বিরাট ষড়যন্ত্র, এক বিরাট অপরাধ — যার বিচার কবে হবে — এখুনি বলা যাচ্ছে না।

ফতেপুর সিক্রি নিয়েও আমাদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে একই রকম মিথ্যাচার করা হয়েছে। ফতেপুর সিক্রী এবং বিখ্যাত বুলন্দ্ দরওয়াজার নির্মাণ কাল নিয়েও সংশয়। সত্যই যদি আকবর ফতেপুর সিক্রী নির্মাণ করতেন তাহলে এ ধন্দ থাকত না।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে কী লেখা আছে এবং সমসাময়িক ইতিহাস কী বলছে, সেই বিষয়ে যাওয়ার আগে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সংবাদ পাঠকদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। এবং তা হল —

১৯৯৯ সালের আগষ্ট মাসে প্রত্নতাত্ত্বিক ড. ধরমবীর শর্মা তাঁর তিনজন সহকারী নিয়ে ফতেপুর সিক্রীতে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শুরু করেন। সেই তিন সঙ্গী হলেন কর্ণাটকের রমেশ মুলিমানি, মণিপুরের কামেই অথৈলু কাবুই এবং উত্তর প্রদেশের আর. কে. তেওয়ারী। (ইণ্ডিয়া টু-ডে ম্যাগাজিনের ২০০০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী, সংখ্যায় এস. কালিদাস — সিক্রিস নিউ পাস্ট' নামে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন)।

প্রথমে যে ঢিবি নিয়ে ড. ধরমবীর ও তার সঙ্গীরা কাজ শুরু করেন তার নাম ছিল বীর ছবিলী দাস ঢিবি। সেইখান থেকে জৈন তীর্থঙ্করদের অনেক মূর্তি উদ্ধার করা হয়। কিছু মূর্তি দ্বিতীয় শতকেরও কিছু মূর্তি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে সব মূর্তিই মস্তকহীন — অর্থাৎ মূর্তিগুলির মাথা ভেঙ্গে গিয়ে মাটির গভীরে

প্রোথিত করা হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় লেখা কিছু শিলালিপিও উদ্ধার হয়েছে। তা থেজে জানা যায় যে এক কালে ঐ স্থানের নাম ছিল 'সৈকরিক্য'। 'সৈকরিক্য' শব্দ থেকে 'সিক্রি' শব্দ এসেছে বলে অনুমান করা যায়। এক কালে সৈকরিক্যে এক বিশাল জৈন মঠ ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

দৈনিক চেতনায় এই প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন কেউ কেউ আমায় প্রশ্ন করেছিলেন — বহিরাগত মুসলিম আক্রমণকারীরা এইরকম ভাবে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতীয়কে হত্যা করার সুযোগ পেত কী করে —

এই প্রশ্নের উত্তরে বলি — ভারতবর্ষের হিন্দু রাজারা যুদ্ধের একটি নিয়ম মেনে চলত। সেই নিয়মাবলী ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। যারা মহাভারত পড়েছেন তারা জানবেন — না পড়া থাকলে পড়ে নিন — ভীষ্মপর্ব। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত মহাভারত এর প্রথম খণ্ডের পৃ. ৮৬৮ (প্রকাশক তুলিকলম, ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯)। এছাড়াও ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর ঐ পুস্তকের ১৩৮ পৃষ্ঠায় সহজ করে লেখা আছে। আমি মহাভারত থেকে উদ্ধৃত করছি —

"অনন্তর কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা সময় নির্দেশ পূর্বক যুদ্ধের নিয়ম নিদ্ধারিত করিলেন। তুল্যগন — সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায়যুদ্ধ করিবে। কোনরূপ প্রতারণা করা হইবে না। ইহাতে আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার পরস্পরের প্রতি সংস্থাপিত হইবে। বাগযুদ্ধ আরম্ভ হইলে বাক্যদ্বারাই যুদ্ধ হইবে, সেনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইালে তাহাকে প্রহার করা হইবে না, রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারূঢ় অশ্বারূঢ়ের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে যুদ্ধ প্রবৃত হইবে। অগ্রে সর্তক করিয়া পশ্চাৎ প্রহার করিবে। বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। যে কোন ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণশস্ত্র (যার অস্ত্র শেষ হয়ে গেছে) বর্মবিরহিত ও সমরপরাঙমুখ হইবে, কদাচ তাহাকে প্রহার করিবে না। সারথি, বাহন, অস্ত্রশস্ত্রাদি বাহক, ভেরী ও শঙ্খবাদককে কদাচ আঘাত করা হইবে না।"

ভারতীয় হিন্দু রাজারা এই সংস্কৃতি মেনে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অসামরিক কোন ব্যক্তির হত্যা নিষিদ্ধ। এমন কি সামরিক ব্যক্তিরাও সকলে বধ্য ছিলেন না।

মুসলমান ভারত আক্রমণকারীরা কোন নিয়ম নীতির ধার ধারত না। কাফের মাত্রেই বধ্য — সে সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি তার বিচার দরকার ছিল না। অনেক সময় এমনও হয়েছে মুসলিম আক্রমণকারী হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারল না, তখন অসামরিক ব্যক্তিদের উপর এমনই অত্যাচার করত যে হিন্দু রাজা সেই সেই প্রজাদের খাতিরে আত্মসমর্পন করত। পরে সেই রাজাও মারা যেত প্রজারাও নিহত হত। যে সব যুদ্ধে হিন্দু রাজারা জয়ী হতেন তারা ভারতীয় সংস্কৃতি মেনে পরাজিতদের হত্যা করতেন না। রাজা পৃথ্বিরাজ ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করেও বধ করেননি। ১১৯২তে সেই মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে বধ করেন।

অত্যন্ত সুসভ্য ও পরিশীলিত এক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ভারতীয় হিন্দু নরপতিরা আক্রমণকারী মুসলমানদের চরিত্র বুঝতে পারেন নি। কাফের নিধন তত্ত্ব তাদের জানা ছিল না। যুদ্ধের মধ্যেও ন্যায় নীতি ও মূল্যবোধ মানতেন তারা। প্রতিপক্ষরা যে কাফের নিধন তত্ত্বের খাতিরে কিছুই মানেন না — এটা হিন্দু রাজারা জানতেন না। তাই লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিহত হয়েছিল। তার মানে এই নয় যে, হিন্দু রাজারা দুর্বল ছিলেন। হিন্দু রাজারা দুর্বল ছিলেন না বলেই এক হাজার বছরের চেষ্টাতেও এই দেশকে ইসলামায়িত করা যায় নি — আরবায়িত করা যায় নি — যা নাকি মাত্র ১০০ বছরের মধ্যেই মধ্য এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকায় সম্ভব হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে ড. রামগোপাল মিশ্রর পুস্তকের কথা উল্লেখ করছি। আরও দুটি পুস্তক পাঠকদের অবশ্যই পড়ে নেওয়ার অনুরোধ জানাব। তাহলেই হিন্দু রাজাদের অপরিসীম বীরত্ব গাথা ও হিন্দু মহিলাদের অপরিমেয় আত্মত্যাগের কাহিনী জানা যাবে।

১. ভারতের ইতিহাসের ছয়টি স্বর্ণময় অধ্যায় — বিনায়ক দামোদর সভারকর। বাংলা অনুবাদ শ্রী সুকুমার নন্দী। প্রকাশক ঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা, ১৬২, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০১২, ১২৫ টাকা।

২. Herioc Hindu Resistance to Muslim Invaders (636AD-1206 AD) Sitaram Goel, Voice of India, 2/18 Ansari Rd. New Delhi, 02.

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী তার রচিত — ফতেপুর সিক্রীর ইতিকথা প্রবন্ধে দেশী, বিদেশী ও সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকদের সমস্ত লেখার উল্লেখ করেছেন। তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত হ'ল —

সম্রাট আকবরের ফতেপুর সিক্রীতে আদৌ কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেন নি। যে প্রাসাদ আকবর তৈরী করেছেন বলে আজ বলা হয়ে থাকে তা প্রকৃত পক্ষে রাজপুত রাজাদের তৈরী। আকবরের অনেক আগে বাবরের সময়ও ঐ দুর্গ প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল এবং তখন তা মহারানা সংগ্রাম সিংহের দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গের নিকটতম প্রান্তরেই রানা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ হয়, যা ইতিহাসে 'খানুয়ার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। যুদ্ধে রানা সংগ্রাম সিংহ পরাজিত হলে ঐ দুর্গ মুসলমানরা দখল করে।

ড. ব্রহ্মচারী বিষয়টি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং যা যা সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন আমি সেভাবেই পাঠকদের সামনে রাখছি।

আমাদের ঐতিহাসিকরা এতদিন প্রচার করে এসেছেন যে, আজকার ফতেপুর সিক্রী এককালে জনমানবহীন এক ঘন জঙ্গল ছিল। সেই বনের মধ্যে বাদশা আকবরের গুরু সেলিম চিস্তি ১৫৩৭ সাল থেকে কুটীর তৈরী করে বসবাস করতেন। (মনে রাখতে হবে বাবর দিল্লী দখল করেন ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে এবং আকবর বাবরের নাতি। ১৫৩৭ সালে হুমায়ুন শেরশাহের ঘাঁটি চুনার দুর্গ দখল করেন ও ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে শেরশাহ এর কাছে পরাজিত হয়ে পারস্যে পলায়ন করেন) সেলিম চিস্তির অনুগ্রহে দুই ছেলে জন্মাবার পর ফতেপুর সিক্রী জায়গাটা আকবরের কাছে খুব পয়মন্ত মনে হয়। তাই তিনি

প্রাসাদ, দুর্গ, অট্টালিকা নির্মাণ করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরের এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এভাবেই ফতেপুর সিক্রী নগরের পত্তন হল।

নিজামুদ্দীন রচিত তাবাকৎ-ই-আকবরী বলছে 'সম্রাটের বেশ কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল, কিন্তু তার একটিও বাঁচল না। আগ্রা থেকে ১২ ক্রোশ দূরে সিক্রিতে সেলিম চিস্তি বাস করতেন এবং তিনি আকবরকে পুত্র সন্তানের আশ্বাস দিলে সম্রাট খুশী হন। যখন সম্রাটের পত্নীদের মধ্যে একজন গর্ভবতী হলেন, সম্রাট তাকে সিক্রিতে পাঠিয়েছিলেন। তখনই সম্রাট ঐ জায়গার নাম সিক্রির বদলে ফতেপুর রাখলেন এবং সেখানে একটি বাজার বসালেন ও একটি স্নানাগার নির্মাণ করলেন।"

(ইলিয়ট-ডসন, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩)

৯৭৭ হিজরীর ১৮ রবিউল আউয়াল মাসে (৩০.০৮.১৫৬৯) সেখানে সেলিম চিস্তির কুটীরে শেখ সেলিম মীর্জার (পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর) জন্ম হল। ঐতিহাসিকদের মতে মাত্র দু'বছর পরে ১৫৭১ সালে আকবর তার রাজধানী আগ্রা থেকে ফতেপুর সিক্রীতে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করেন।

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে সম্রাট আকবর ১৫৭১ সালে অখ্যাত গ্রাম সিক্রীকে এক বিশাল নগরে রূপান্তরের কাজ শুরু করেন। ১৪-১৫ বছরের মধ্যে কাজ শেষ হয়। গুজরাট জয় করার পর নাম পাল্টে ফতেহাবাদ রাখেন। ১৫৭৫-৭৬ সালে গুজরাট বিজয়ের পর স্মারক হিসাবে বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করা হয়। (V. A. Smith ঐ পুস্তক পৃ. ১০৫, ১০৭)

কিন্তু বুলন্দ দরওয়াজার গায়ে যে শিলালিপি অংকিত আছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে ১৬০১ সালে দাক্ষিণাত্য অভিযান থেকে ফিরে এলে ঐ দরওয়াজা নির্মিত হয়।

স্মিথের মতে, ১৫৮৫ সালে জলাভাবে সিক্রি পরিত্যক্ত হয়। কাজেই ১৬০১-এ বুলন্দদরওয়াজা নির্মিত হওয়া সম্ভব নয়। অপর দিকে আবার কিছু ঐতিহাসিক বলেছেন যে ১৬০৪ সালে সিক্রি পরিত্যক্ত হয় এবং বুলন্দ দরওয়াজা ১৬০১ সালে নির্মিত হয়। (History and Culture of Indian People - R. C. Majumdar, Vol. - 7, Page - 760)

অতএব ফতেপুর সিক্রী এবং সেখানকার বুলন্দ দরওয়াজা দুটো বিষয়েই ঐতিহাসিকরা একমত নন। লক্ষ্য করার বিষয় এখন যেখানে বুলন্দ দরওয়াজা সেখানে আগের একটা ফটক বা দরওয়াজা ছিল, আর. সি. মজুমদার সম্পাদিত উক্ত পুস্তকের ৭ম খণ্ডের ৭৬৩ পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে - জাম-ই-মসজিদের কাছে, ফতেপুর সিক্রীর দক্ষিণের প্রবেশ পথকেই উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচিত করা হ'ল এবং সাবেক ফটক ভেঙ্গে সেখানে তৈরী করা হ'ল এক বিরাট ফটক। এরই নাম বুলন্দ দরওয়াজা।

আর একদল ঐতিহাসিক বলেন যে ফতেপুর সিক্রী বা সিক্রী এককালে খুব বর্দ্ধিষ্ণু জায়গা ছিল। বুলন্দ দরওয়াজা যে জায়গায় সেখানকার এক সুদৃশ্য ফটক সহ বিশাল দুর্গ ছিল। ঐ দুর্গ মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের অধীনে ছিল এবং দুর্গের নিকটবর্তী প্রান্তরেই রানা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'খানুয়ার যুদ্ধ',

নামে পরিচিত। যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহ পরাজিত হলে ঐ দুর্গ মুসলিম শাসকদের দখলে চলে যায়।

তারিখ-ই-মুবারক শাহী নামক গ্রন্থে ইয়াহিয়া-বিন-আহম্মদ লিখেছেন যে ১৪০৫ সালে ফতেপুরর অদূরে খিজির খাঁ ও ইকবাল খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইকবাল খাঁ পরাজিত হন। খিজির খাঁ তাকে হত্যা করে তার মাথা ফতেপুরে পাঠিয়ে দেয় (Elliot & Dowson Vol-IV Page-40)। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আকবরের ১৫০/২০০ বছর আগেও ফতেপুর সিক্রী ছিল। ঐ বইতে আরও বলা হয়েছে — পূর্বে যার নাম সিক্রী ছিল, তারই বর্তমান নাম ফতেপুর এবং মালিক খইরুদ্দীন তুফাকে এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বাবরের আত্মজীবনীতেও খানুয়ার যুদ্ধের বর্ণনা আছে এবং তাতে সিক্রীর কথাও আছে। ফতেপুর সিক্রীর নগর প্রাচীরের বাইরে ছিল বাবরের শিবির আর ভিতরে ছিল রাজপুত শিবির। রায়সিন দুর্গের প্রধান সেনাপতি শিলাদিত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭ মার্চ সিক্রীর অদূরে আগ্রা থেকে প্রায় ৩৭ মাইল দূরে খানুয়ার যুদ্ধে রানা সংগ্রাম সিংহের পরাজয় হয়। কত হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল তার কোন হিসাব পাওয়া যায় না। বাবর হুকুম দিলেন কাছাকাছি একটা পাহাড়ের কাছে সমস্ত নরমুণ্ড জড়ো করে একটি স্তম্ভ তৈরী করতে। (Elliot & Dowson Vol-IV Page-272)

ফতেপুর সিক্রীর সমস্ত প্রাসাদ, দুর্গ, অট্টালিকা ১৪/১৫ বছরের মধ্যে তৈরী করা অসম্ভব বলেই জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে আকবর যেন যাদুমন্ত্রবলে ঐ অল্প সময়ের মধ্যে পুরো ফতেপুর সিক্রী নগরী নির্মাণ করে ফেললেন।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভিতরের জাম-ই-মসজিদ এবং বুলন্দ দরওয়াজা আকবরের তৈরি। সিক্রী দুর্গের ভিতরের যত প্রাসাদ আছে, যেমন দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, যোধাবাঈ প্রাসাদ, রাজা বীরবলের প্রাসাদ, তানসেনের প্রাসাদ, নবরত্ন সভা প্রায় সম্পূর্ণ রাজপুত অথবা রাজপুত গুজরাটি মিশ্র শৈলীতে তৈরী। দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে, ঘন্টা, পদ্মফুল, শিকল ও ঘন্টা যা নির্ভেজাল হিন্দু শৈলীর নিদর্শন।

(ড. ব্রহ্মচারীর পুস্তক পৃ. ১৪৫)

রূপকথার গল্প হিসাবে যখন রূপকথা পড়ি তখন খারাপ লাগে না। কিন্তু ইতিহাস হিসাবে যখন রূপকথা হাজির করা হয় তখন তা ভাল লাগার কথা নয়। আমাদের ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে এতই বিকৃত করেছেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে যে তা ইতিহাস তো নয়ই রূপকথাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

সম্রাট শেরশাহ এই রকম এক সম্রাট যাকে আমাদের ঐতিহাসিকরা রূপকথার নায়ক বানিয়েছেন। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। আমার এক বন্ধু পড়তো মডেল স্কুলে। সেই সময় ঐ স্কুলের ইতিহাস পড়াতেন প্রয়াত রজনীবাবু (রজনীকান্ত মণ্ডল)। শেরশাহ পড়ানোর সময় রজনীবাবু বলেছেন — সম্রাট শেরশাই প্রথম ঘোড়ার ডাক প্রচলন করেন। একথা শুনেই আমার বন্ধু জিজ্ঞেস করল — স্যার তাহলে শেরশাহের আগে (অর্থাৎ

১৫৪০ সালের আগে) কোন ঘোড়া কি ডাকত না। (অর্থাৎ শব্দ করত না) ? রজনীবাবু ছিলেন খুব ভাল এবং রসিক মানুষ। সারা ক্লাস ঘর হেসে গড়িয়ে পড়ল স্যারের সঙ্গে। পরের কয়েকদিনও স্কুলে এই নিয়ে প্রচুর হাসি হেসেছেন সবাই।

শেরশাহ সম্পর্কে আমাদের ঐতিহাসিকরা যা লিখেছেন — তা সত্যিই শেরশাহের আগে ঘোড়া না ডাকার মত।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শেরশাহ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করলেন। ঐ বছরই পাঞ্জাবের গক্কর জাতির বিদ্রোহ দমন করতে তাকে ঝিলম নদীর তীরে যেতে হয়। ১৫৪১ সালের মার্চ মাসে তাকে বাংলায় আসতে হয় — বিদ্রোহ দমন করতে। ১৫৪২-এ রাজপুত রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান করে মালব অধিকার করেন। ১৫৪৩ সালে রায়সিনের রাজা পুরণমলের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সেই বছরই মারওয়াদের রাজপুত রাজার বিরুদ্ধে অভিযান। পরের বছর — ১৫৪৪ সালে রাঠোররাজ মালবদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর দূর্গে এক অগ্নি দুর্ঘটনায় তিন মারা যান। এই হল শেরশাহের ৫ বছর রাজত্বকাল। শুধু কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করতেই তার ১ বছর কেটেছে।

সময়টা ছিল মোঘল-পাঠান দ্বন্দ্বের সময়। এছাড়াও হিন্দু রাজাদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। স্বভাবতই এই স্বল্পকাল রাজত্বে এত যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্বের মধ্যেও শেরশাহ ৩৬০০ কিমি রাস্তা বানালেন কবে ? তখনকার দিনে রাস্তা নির্মাণ প্রযুক্তি কিছু ছিল না। আজ রাস্তা নির্মাণের এত প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও অটল বিহারী বাজপেয়ী স্বর্ণ চতুর্ভুজ ৫ বছরে সম্পূর্ণ করাতে পারলেন না। ৫ বছর ধরে অন্য কিছু না করে শুধু রাস্তা তৈরী করলেও এত রাস্তা করা যায় না কোন অঙ্কেই।

অন্যান্য সম্রাটদের ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখেছি — শেরশাহর ক্ষেত্রেও দেখছি যে সমসাময়িক ইতিহাসকাররা এই রাস্তা তৈরীর বিষয়টি উল্লেখ করেন নি। একমাত্র শেখ নুরুল হক রচিত — 'জবদাতুৎ তাওয়ারিখ' গ্রন্থে শেরশাহের রাস্তা তৈরীর কথা আছে। তবে তা ঐ ৬২০০ কিমি নয়। ঐ বইতে আছে যে শেরশাহ দিল্লী থেকে আগ্রা রাস্তা তৈরী করেছিলেন।

(Elliot & Dowson Vol-VI Page-188)

বহিরাগত মুসলিম আক্রমণকারীরা ভারতে আসার আগে যথেষ্ট সংখ্যক রাস্তাই ছিল তা নাহলে এত যুদ্ধের এত বাহিনী, ব্যবসা বানিজ্যের এত মানুষ — এত তীর্থযাত্রী এরা কি সব বাড়ীর বাইরে বেরোতেন না ? এ ব্যাপরে কোন সন্দেহ নাই যে চার ঘোড়ার রথ যাওয়ার মত রাস্তা ভারতে ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যোদ্ধা রাজারা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন।

আমাদের ঐতিহাসিকরা ৫ বছর ধরে ব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত শেরশাহকে দিয়ে কয়েক হাজার মাইল রাস্তা তৈরী করিয়েছেন, প্রচুর বৃক্ষ রোপন করিয়েছেন, প্রচুর সরাইখানা - হিন্দুদের আলাদা, তৈরী করিয়েছেন। অর্থাৎ শেরশাহের আগে কোন ঘোড়া ডাকত না, তিনিই ডাকিয়েছেন।

শেরশাহ সম্পর্কে আমাদের ঐতিহাসিকরা আরও মুখর। তিনি বিরল সামরিক প্রতিভা, তিনি প্রজাবৎসল পরধর্মসহিষ্ণু, সুশাসক, রাজস্ব সংস্কারক, শিক্ষা ও শিল্পানুরাগী।

কিন্তু শেরশাহ প্রকৃত পক্ষে কেমন ছিলেন তা পাওয়া যায় আব্বাস খাঁ সারওয়ানি রচিত তারখি-ই-শেরশাহী গ্রন্থে। (Elliot & Dowson এর বইর ৪র্থ খণ্ডে তার উল্লেখ আছে) আব্বাস খাঁ সারওয়ানি বৈবাহিক সূত্রে শেরশাহের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তার পক্ষে অনেক খুঁটিনাটি খবর পাওয়া সম্ভব ছিল। এই বই থেকে শেরশাহের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আমাদের ঐতিহাসিকদের দেওয়া পরধর্ম সহিষ্ণুতা, প্রজা বাৎসল্য ইত্যাদির সঙ্গে মেলে না।

মুসলিম পরাধীনতার যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে, যখনই কোন নতুন ব্যক্তি দিল্লীর বাদশাহ হয়ে এসেছেন, তখনই তাকে রাজ্য বিস্তারের জন্য দৌড়াতে হয়েছে। গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিযান করতে হয়েছে। গোয়ালিয়র, রায়সিন, রণথম্ভোর, চিতোর ইত্যাদি দুর্গ দখল করতে হচ্ছে এবং সেই জন্য অনেক যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। কাজেই প্রশ্ন হল — কেন এই দুর্গ বা একই অঞ্চল বিভিন্ন বাদশাকে বারবার অভিযান করতে হচ্ছে। উত্তর একটাই। মুসলিম বিদেশী আক্রমণকারীরা কোন দুর্গ বা অঞ্চল বেশী দিন তাদের দখলে রাখতে পারতেন না। স্থানীয় ঐ সব রাজারা ক্রমাগত বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, দিল্লীর শাসন অস্বীকার করেছে। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে ভারতের হিন্দু রাজারা নিরন্তর সংঘর্ষ করেছে এবং অসংখ্য হিন্দু প্রাণ দিয়েছে। বিদেশী মুসলিম আক্রমণকারীদের নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়নি।

অথচ আমাদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে এসবের কোন উল্লেখ নেই। বিদেশী আক্রমণকারীদের বীর গাথাই আমাদের ইতিহাস।

বিখ্যাত মার্কিন চিন্তাবিদ উইল ডুরান্ট তাঁর History of civilization গ্রন্থে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলেছেন — ভারতবর্ষ সমগ্র মানবজাতির মাতৃভূমি এবং সংস্কৃত হল সমস্ত ইউরোপীয় ভাষার জননী। ভারত আমাদের দর্শন শাস্ত্রের মাতা, আরবদের মাধ্যমে ভারত আমাদের গণিত শাস্ত্রের মাতা, বুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারত খৃষ্ট ধর্মের মূল তত্ত্বের মাতা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে ভারত আজকের গণতন্ত্র ও স্বশাসনের মাতা। (আর্য সভ্যতার সাধনা কে. এন. দাশগুপ্ত, পৃ. ৭০, ড. ব্রহ্মচারীর পুস্তক পৃ. ৫৮) বলা হয়ে থাকে শেরশাহ গ্রান্ডট্র্যাংক রোড তৈরী করেছিলেন। এই রাস্তা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সোনার গাঁ থেকে পাঞ্জাবের সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের একচ্ছত্রাধিপতি শেরশাহ ছিলেন না। শুধু শেরশাহ কেন দিল্লীর কোন বাদশাই কখনও এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হতে পারেন নি। আর আধিপত্যই যদি না থাকে রাস্তা নির্মাণ সম্ভব কী করে? এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে প্রচুর নদ-নদী আছে সবগুলির উপর সেতু নির্মাণ ঐ সময়কার প্রযুক্তিতে মাত্র ৫ বছরের মধ্যে এক অলৌকিক ব্যাপার হতে পারে, রূপকথার গল্প হতে পারে কিন্তু ইতিহাস হতে পারে না। আর তিনি সত্যিই এই কাজ করে থাকলে সমসাময়িক ইতিহাসে তার উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল।

আমাদের ঐতিহাসিকরা শেরশাহকে দিয়ে শুধু জি. টি. রোড তৈরী করিয়ে ক্ষান্ত হননি। আরও (১) আগ্রা থেকে বুরহানপুর (৬০০ মাইল), (২) আগ্রা থেকে চিতোর হয়ে যোধপুর (২০০ মাইল), (৩) লাহোর থেকে মুলতান (১০০ মাইল) রাস্তা তৈরী করিয়েছেন। একদল ঐতিহাসিক বলেছেন ৩৯০০ মাইল বা ৬২৪০ কিমি আর একদল বলেছেন ২৩০০ মাইল বা ৩৬৮০ কিমি। কিন্তু তাদের তথ্যসূত্র কী তা উল্লেখ করেন নি। রূপকথার কোন তথ্যসূত্র থাকে না।

শাহাজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাস পাওয়া যায় সমসাময়িক যেসব ইতিহাস বইতে সেগুলি সবই মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত। সেগুলি কোন হিন্দু, কোন আর এস এস, কোন বিজেপি বা এই ধরণের তথাকথিত কোন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তির নয়। আর ঐ সব পুস্তক মার্ক্স মেকলে পন্থীদের জন্মের বহুকাল আগেই ঐ সকল ইতিহাস গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। সেই ইতিহাস গ্রন্থগুলি তাজমহল এবং শাহাজাহান বা মুঘল সম্রাটদের সম্পর্কে যে সব তথ্য উপস্থাপিত করেছে সেগুলি অনুসারে যে কোন ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে শাজাহান কোন তাজমহল নির্মাণ করাননি। ঐ সকল তথ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জানতেন না হয়ত, ডি. এল. রায়ও হয়ত জানতেন না — তাই ১৫০ বছর ধরে যে ভুল, মিথ্যা ও বিকৃত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক এদেশে প্রচলিত আছে তাঁরা সেই সব সূত্রের উপরই নির্ভর করেছিলেন। প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ঐ সকল মুসলিম গ্রন্থকার রচিত ইতিহাস পুস্তকগুলি আরবী হরফে আরবী ভাষায় বা ফার্সী ভাষায় লিখিত। রবীন্দ্রনাথ বা ডি. এল. রায় তা পড়ার সুযোগ পান নি — তাছাড়া ১৫০ বছর ধরে যে ইতিহাস পড়নো হচ্ছে সে বিষয়েও তাঁদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। Sir H. M. Elliot এবং J. Dowson এর বই The Hisotry of India as told by its own Historians যদিও ১৮৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৯০ সালের আগে ঐ গ্রন্থ সহজলভ্য ছিল না। ঐ দুই গ্রন্থকার মুসলিম ঐতিহাসিকদের বইগুলি ইংরাজী ভাষায় আমাদের সামনে উপস্থিত না করলে সাধারণ পাঠকরা আজও তা জানতে পারতেন না।

ভারতীয় লেখক পুরুষোত্তম দাস নাগেশ ওক The Tajmahal is a Temple palace নামে পুস্তকটি রচনা করে - সর্বপ্রথম এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তার যুক্তি ও তথ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা তা গ্রহণ করতে চান নি। কারণ ততদিনে মার্কস মেকলে পন্থীরা ভারতবর্ষের শিক্ষাজগৎ, ইতিহাস জগৎ এবং সংবাদ মাধ্যম জগতে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই তাদের ধারণার বিরুদ্ধে যতই শক্তিশালী যুক্তি ও তথ্য দেওয়া হক না কেন মার্কস মেকলে পন্থীরা তা গ্রহণ করা দুরস্থান তার বিরোধিতা করেছে। ঐ সব যুক্তি ও তথ্য মেনে নিলে তাদের সমূহ সর্বনাশের কারণ ঘটত।

কিন্তু যারা নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস জানতে চান তাদের কাছে সত্যি ঘটনাটা উল্লেখ করা দরকার। বহিরাগত মুসলিম আক্রমণকারীরা তাদের কাফের নিধন তত্ত্ব ও অংশীবাদী তত্ত্ব নিয়ে ভারতের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে সে ইতিহাস এক বিশেষ উদ্দেশ্যে

ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয় না। আকবরকে 'মহামতি' বলা হয় কিন্তু তিনি আদৌ তা ছিলেন না — তা সেই সময়কার মুসলিম ঐতিহাসিকদের কাছ থেকেই জানা যায়। সম্রাট শাজাহান যে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তার পক্ষে কোন সুস্থ ও সুন্দর কাজ করা সম্ভব নয় তা মুসলিম ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বই থেকেই জানা যায়। তার বাবা তাকে 'শয়তান' বলতেন আর তার ছেলে তাকে বন্দী করে রাখেন — এমনই ব্যক্তি তিনি। তিনিই নাকি মহান প্রেমিক।

সমগ্র মধ্যযুগের বহিরাগত মুসলিম আক্রমণকারীরা কী প্রকৃতির ছিলেন আর তাদের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা যে কত বীভৎস ছিল তার ইতিহাস মুসলিম ঐতিহাসিকদের পুস্তক থেকেই এক একজনের নাম করেই লেখা যায়। আজ আমরা সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। এখন তাজমহল প্রসঙ্গ।

শাহাজাহানের সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিক ও লিপিকারদের লেখার মধ্যে তাজমহল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্যপূর্ণ বিবরণ নাই। এত বড় ঘটনা ঘটল এত মহান কীর্তি রচিত হল অথচ সমসাময়িকরা তার বিশদ উল্লেখ করলেন না। — এমন কি সরকারী নথী ও হিসাবপত্রের বইতেও তেমন কিছু নাই — এটাই কি শাজাহানের তাজমহল নির্মাণের ঘটনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণ করে না ? সমসাময়িক যেসব গ্রন্থে শাহাজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাস পাওয়া যায় সেগুলি হল —

১. আবুল হামিদ রচিত — বাদশানামা
২. সম্রাট জাহাঙ্গীর রচিত — আত্মজীবনী ওয়াকিঅৎ জাহাঙ্গীরি
৩. ইনায়েৎ খাঁ রচিত — শাহাজাহান্ নামা
৪. মুফাজ্জল খাঁ রচিত — তারিখ-ই-মুফাজ্জলি
৫. বখ্তিয়ার খাঁ রচিত — মিরাৎ-ই-আলম্
৬. মহম্মদ কাদিম রচিত — আলমগির নামা
৭. কাফি খাঁ রচিত — পুস্তাখাবুল লুবাব

(ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী পুস্তক — পৃ. ৮৯)

৮. উপরোক্ত গুলি ব্যতীত আছে ইউরোপীয় বণিক ও পর্যটক Tavernier (তাভার্নিয়ে)। তিনি ভারতে এসেছিলেন ১৬৪১ খৃ. তিনি ১৬৬৮ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৭ বছর ধরে ভারতে যাতায়াত করলেও, ১৬৫৮ তে একবার ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হন। তাভার্নিয়ে বিদ্বান ছিলেন না। তার দৃষ্টি মূলতঃ বাণিজ্য ও সম্পদের উপর নিবদ্ধ ছিল।

৯. শাহজাহানের সরকারী নথী

তাজমহলের নির্মাণকাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যদি শাজাহান সত্যিই তাজমহল নির্মাণ করাতেন তবে এ সম্পর্কে কল্পনার কোন প্রয়োজন হত না। সরকারী নথীতেই এ বিষয়ে সঠিক সব কিছুর উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল।

শাজাহানের যে বেগমের স্মৃতিতে তাজমহল নির্মিত বলে প্রচার তাঁর নাম ছিল আরজুমন্দবানু। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে সম্রাটের বিয়ে হয়। বিবাহিত জীবনের ১৮ বছরের মাথায় ১৪ তম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে বর্তমানে ভুসাওয়ালের কাছে বুরহানপুরে

তাঁর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর তারিখ নিয়েও মতভেদ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক তার মৃত্যুর তারিখ বলেন ৭ জুন ১৬৩১ আবার কেউ কেউ বলেন ১৭ জুন ১৬৩০। মৃত্যুর পর বুরহানপুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। পরে আগ্রায় তাজমহলে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। বুরহানপুর থেকে আগ্রাহ মৃতদেহ এক বছরের মধ্যে আনা হয়েছিল। কিন্তু এক বছরের মধ্যে কি তাজমহল নির্মাণ সম্ভব ?

তাজমহলের নির্মাণ কবে শুরু এবং কবে শেষ হয়েছে সে বিষয়ে চূড়ান্ত মতানৈক্য আছে। একই রকম মতানৈক্য খরচ সম্পর্কে। সমস্ত মতামতকে এক জায়গায় করে ড. ব্রহ্মচারী একটি সারণী প্রস্তুত করেছেন। সেই সারণী নীচে দেওয়া হল।

তাজমহল এর নির্মাণ কাল

	নির্মাণ শুরু	নির্মাণ শেষ	ব্যয়িত সময়	সূত্র
১.	১৬৩২	১৬৫৪	২২ বছর	এনসাইক্লোপিডিয়া
২.	১৬৩২	১৬৫০	১৮ বছর	মহম্মদদীন ইসলাসট্রেটেড উইকলি, ১৯৫১
৩.	১৬৩১	১৬৪৮	১৭ বছর	আর. সি. আরোরা
৪.	১৬৪১	১৬৬৩	২২ বছর	তাভার্নিয়ে
৫.	১৬৩০	১৬৪৮	১৮ বছর	কলম্বিয়া গেজেটিয়ার ·

এই তারিখগুলির মধ্যে তাভার্নিয়ের হিসাবটা ভুল বলেই মনে হয়। কারণ এই হিসাব অনুযায়ী আরজুমন্দবানুর মৃত্যুর ১০ বছর পর তাজমহল নির্মাণ শুরু হয় এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তা শেষ হয়।

তাজমহল নির্মাণে কত অর্থ ব্যয় হয়েছিল সে বিষয়েও বহু রকম অঙ্ক পাওয়া যায়।

বাদশানামার কথা অনুসারে এই বাবদে রাজকোষের ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। কিন্তু ঐ টাকায় ঐ নির্মাণ অসম্ভব বুঝে পরবর্তীকালে এই ব্যয়ের অঙ্ক যে যার খুশীমত বসিয়েছেন বা লিখেছেন। ড. ব্রহ্মচারী এ বিষয়ে যে সারণীটি প্রস্তুত করেছেন তা এই রকম।

	খরচ টাকার অংকে	সূত্র
১.	৪০ লক্ষ	বাদশানামা (লাহোরী প্রণীত)
২.	৫০ লক্ষ	রমেশ চন্দ্র মজুমদার
৩.	৫০ লক্ষ	অতুল চন্দ্র রায়
৪.	১ কোটি ৫০ লক্ষ	মহম্মদ দীন
৫.	১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৫ হাজার	গাইড টু তাজমহল
৬.	৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৮,৮২৬	কানোয়ারলাল
৭.	৯ কোটি ১৭ লক্ষ	কীনস্
৮.	৩ কোটি	তাভার্নিয়ে

গাইড টু তাজমহলে বলা হয়েছে শ্রমের সবটাই আদায় করা হয়েছিল ভয় দেখিয়ে।

খুব কম টাকাই নগদে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যে সামান্য শস্য দেওয়া হত তাও লোভী তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীরা মেরে নিত।

কীন তার বইতে লিখেছেন — শ্রমিকদের জোর করে খাটানো হত। তারা খুব সামান্য অর্থ পেতো। এর উপর ভাগ বসাতো লোভী কর্মচারীরা। শ্রমিকদের মৃত্যুহার ও দুর্দশা এতই গভীর ছিল হতাশায় তারা গাইতো —

ঈশ্বর দয়া করুন আমাদের দুর্দশায়
কেননা, আমরাও মরছি সম্রাজ্ঞীর সাথে।

তখন কোন ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। তাই অনুমান করা যায় যে, শ্রমিকরা শেখানো কথা বলেনি, বলেছে নিজের উপলব্ধির কথা। মৃত্যুহার বেশী থাকায় কিছুদিন অন্তর সম্পূর্ণ নতুন শ্রমিকদল আনতে হত। ফলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ২০ হাজার হলেও হতে পারে।

তাজমহলের নক্সাকারক ও কারিগরদের নিয়েও প্রচুর বিভ্রান্তি। শত শত বছর ধরে একটা কল্পনাকে সত্যের রূপ দিতে গিয়েই এত বিভ্রান্তি। একটা ঢাকতে আর একটা।

শাহাজাহানের সভাসদ ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লোহারী তার প্রণীত বাদশানামায় কোন স্থপতির নাম উল্লেখ করেন নি। কারণ তিনি লিখেছেন যে একটি হিন্দু প্রাসাদ দখল করে আরজুমন্দবানুর সমাধি করা হয়েছিল। (পরে বিস্তৃত লিখছি)

মহারাষ্ট্রীয় জ্ঞানকোষ-এ মকামল খান ও আবদুল করিম এবং কিছু মজদুরের কথা আছে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় লিখেছে স্থপতিদের একটি সমিতি তৈরী করা হয়েছিল।

কীন বলেছেন — তাজমহলের আদিম বা পুরুষাণুক্রমে তত্ত্বাবধায়কদের হেফাজতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি 'তারিখ-ই-তাজমহল' বইতে তাজমহল নির্মাতা মুখ্য বিশেষজ্ঞদের তালিকা দেওয়া আছে। এদের নেতৃত্বে আছেন মহমদ ঈশা আফান্দি।

মহম্মদ খান এর প্রবন্ধে তাজমহল নির্মাণের কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে জনৈক আহমদ মহান্দিশ ও তার পুত্রকে। কেউ কেউ বলেন তাজমহল এর পরিকল্পনা ইটালীর এক স্থপতির। তার নাম জারেনিমো ভেরোনা।

এটা হাস্যকর যে তখনকার দিনে গ্লোবাল টেন্ডার ডেকে তাজমহলের নক্সা দেওয়া হবে বা বেশ কয়েকটি দেশের স্থপতি মিলে একটি সমিতি তৈরী করবে। গ্লোবাল টেন্ডার যদি ডাকতেই হয় তার জন্য যে সময় দরকার, যখন যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত, সে সময় ছিল না।

একদল কৃতিত্বটা দিচ্ছেন কিছু ইসলামী স্থপতিকে আবার কেউ কোন ইউরোপীয় স্থপতিকে।

আর বাদশানামা, আর. সি. মজুমদার এবং আরও ঐতিহাসিক কিছু উল্লেখ করছেন না।

আগ্রার তাজমহল থেকে ৪ কিমি. দূরে বটেশ্বর নামে একটি জায়গা আছে। ১৯০০ সালে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অধিকর্তা কানিংহাম ঐ বটেশ্বরে একটি ঢিবি খুঁড়ে

একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। ঐ শিলালিপি - বটেশ্বর শিলালিপি নামে পরিচিত। জেনারেল কানিংহাম ঐ শিলালিপি ভারত সরকারের হাতে তুলে দেন এবং বর্তমানে তা লক্ষ্মৌ শহরের সরকারী সংগ্রহশালায় আছে। বটেশ্বর শিলালিপিতে ৩৪টি সংস্কৃত শ্লোক আছে যার মধ্যে ২৫, ২৬ এবং ৩৪ নং শ্লোক তাজমহল প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক।

ডি. কে. কালে তাঁর প্রণীত Epigraphica India (এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিয়া) তে উল্লেখ করেছেন যে বিক্রম সংবৎ ১২১২ সালে (১১৫৬ খৃ.) আশ্বিন মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে চন্দ্রত্রেয় বংশের (চান্দেলবংশ) রাজা পরমার্দিদেব ঐ শিলালিপি স্থাপন করেন।

বটেশ্বর শিলালিপির ২৫ এবং ২৬ নং শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়।

তিনি (সম্রাট পরামার্দিদেব) একটা প্রাসাদ নির্মাণ করালেন আর এর অভ্যন্তরে বিষ্ণুমর্তির পদতলে তিনি নতশিরে স্পর্শ করছেন। (২৫)

সেইরকম, রাজা আর একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেই দেবতার উদ্দেশ্যে। যাঁর মস্তকে আছে সাদা পাথরের অর্দ্ধচন্দ্র। সেই সুন্দর মন্দিরে অধিষ্ঠিত হয়ে দেবতা এত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে, তিনি তার হিমালয় নিবাস কৈলাস পর্বতে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবেন নি। (২৬)

এই লিপির তারিখ ১২১২ বিক্রম সংবৎ আশ্বিন মাস, রবিবার, শুক্লা পঞ্চমী (৩৪)

বটেশ্বর শিলালিপিতে উল্লিখিত আগ্রার সেই দুইটি শ্বেতপাথরের সৌধ গেল কোথায়? আগ্রায় তাজমহল এবং ইদমৎ-উদ্-দৌলা ব্যতীত আর কোন শ্বেত পাথরের সৌধ নাই। তাজমহল আরজুমন্দ বানুর সমাধি এবং ইদমৎ-উদ্-দৌলা নুরজাহানের বাবার সমাধি বলে পরিচিত আমাদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে।

শাহজাহানের শ্বেতপাথর প্রীতি ও এক অলীক ইতিহাস - যার সামান্য সত্যতাও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ করতে পারবেন না।

শাজাহানের তাজমহলের নির্মাণকাল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন তারিখের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দেয় ঔরঙ্গজেবের একটি চিঠি যা তিনি পিতা সম্রাট শাহজাহানকে লিখেছিলেন ১৬৫২ সালে। অর্থাৎ যখন তাজমহলের নির্মাণ কার্য্য (?) শেষ হয়ে গেছিল ধরা যায়। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লী থেকে যাত্রা করেন তখন মহরম মাসের ৩ তারিখে আকবরাবাদ বা আগ্রায় পৌঁছান। পরের দিন তিনি তাজমহলে যান পরিদর্শনে এবং ঐ সৌধের বহুতর মেরামতির প্রয়োজনীয়তার কথা পিতা সম্রাট শাহজাহানকে জানান। কোথাও চুঁইয়ে জল পড়ছে, কোথায় জলে ডুবে গেছে ইত্যাদি। ঔরঙ্গজেব ঐ চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছেন —

আমি ভেবে পাই না, পরবর্তী বর্ষায় বিভিন্ন গম্বুজ, মসজিদ, জমায়েতের স্থান প্রভৃতির কি দশাইনা হবে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় তলার ছাদটি খুলে ফেলে ইঁট, পাথর ও সুড়কি দিয়ে আবার ভরাট করতে হবে।

ঔরঙ্গজেবের এই চিঠির নাম — আদাব-ই-আমলগিরী ও ইয়াদগার-ই-আলমগিরী। জাতীয় মহাফেজ খানায় ফার্সী ভাষায় লিখিত এই পত্র রক্ষিত।

(তাজমহল হিন্দু মন্দির পি এন ওক-র পুস্তকের বঙ্গানুবাদ, পৃ. ২৫-২৬)

তাজমহলের মর্মর সৌধের সম্মুখবর্তী উদ্যানে ১৯৭৩ সালে একটি খনন কার্য হয়। ফোয়ারাগুলিতে গোলযোগ লক্ষিত হওয়ায় মাটির নীচে অবস্থিত প্রধান পাইপটি খুঁটিয়ে দেখার আবশ্যক হয়। ঐ খনন কার্য্যের সময় মাটির অনেক নীচে এক ঝাঁক ফোয়ারার সারি সকলের নজরে পড়ে। ঐগুলি তাজপ্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত। এই খনন কাজের সময় বেশ কিছু গুপ্ত সিঁড়ি, ফাঁপা দেওয়াল ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু তাজমহলের ঐ সব গুপ্ত বিষয়গুলি নিয়ে কোন অনুসন্ধান করা হয়নি। (বিস্তৃত জানতে পি. এন. ওক-এর পুস্তকটি পড়তে হবে)

ঔরঙ্গজেবের চিঠি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাজমহল কোন নবনির্মিত সৌধ নয়। তার চিঠিতে কোন পুরানো সৌধের মেরামতিতে কিছু ত্রুটি ও গাফিলতির উল্লেখ রয়েছে মাত্র।

শাহজাহানের ২১ বছর বয়সে আরজুমন্দবানুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। শাহজাহান তার আগেও অনেক এবং পরেও অনেক বিয়ে করেছেন। আরজুমন্দ-এর মৃত্যুর পরও তিনি বিয়ে করেছেন। তার হারেমে পাঁচ হাজার রমনী ছিলেন। অতএব বিশেষ একজনের প্রতি তার গভীর অনুরক্তি খুব স্বাভাবিক নয়। আর আরজুমন্দবানুর নাম মমতাজ বেগম বলেও কোথায়ও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তার নামে তাজমহল তৈরী হয়নি বরং বহুকালের পুরানো একটি মহল এর সঙ্গে তার নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। বহুকালের এই পুরানো মহল বা সৌধটি ছিল শ্বেত পাথরের। সম্রাট শাহজাহান লোক লাগিয়ে ১২, ১৫, ১৮ বা ২২ বছর ধরে ইসলামী ঢং দিয়েছিলেন, মেরামত করিয়েছিলেন, প্রাসাদের বহু কক্ষ এবং সিঁড়ি মুখ বন্ধ করিয়েছিলেন, কোরানের বাণী উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন, নানারকম মনি মুক্তো বসিয়েছিলেন, মেরামতির কিছু কিছু ত্রুটি ঔরঙ্গজেবেরও নজরে এসেছিল।

আরজুমন্দবানু (মমতাজ-উল-জামানী) ছিলেন জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যতম শ্বশুর মির্জা গিয়াস বেগের দৌহিত্রী। গিয়াসবেগ পারস্য রাজসভার একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন। আরজুমন্দবানুর বাবার নাম জমিনুদৌলা আসফ খান, খাজা আবুল হাসান নামেও পরিচিত। তার মায়ের নাম দিওয়ানজী বেগম। আরজুমন্দবানুর জন্ম হয় ১৫৯৪ এবং শাজাহানের সঙ্গে বিয়ে হয় ১৬১২ তে। আর মৃত্যু হয় ১৬২৯, ১৬৩০ অথবা ১৬৩১ সালে। অর্থাৎ ৩৪/৩৫ বছর বয়সে ১৪টি সন্তানের জন্ম দিয়ে অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের ১৮ বছরে তিনি ১৪টি সন্তানের জন্ম দেন। অর্থাৎ শাজাহান তার প্রিয়তমা মহিষীর শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন না। ২১ বছর বয়সে আরজুমন্দবানুর সঙ্গে বিবাহের আগে এবং পরে এমন কি তাঁর মৃত্যুর পরও শাহাজাহান অনেক বিবাহ করেছিলেন। তার হারেমে থাকত ৫,০০০ রমনী। এছাড়াও মিনা বাজার বসিয়ে রমনী উপহার পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

ইয়োরোপের এক পর্যটক বার্নিয়ের তার ভ্রমণ কাহিনী Travels in the Mughal Empire (ট্রাভেলস্ ইন দি মুঘল এম্পায়ার) বইতে শাজাহানের যে চিত্র দিয়েছেন তা অতিশয় খারাপ। ইতালির ভেনিস শহরের পর্যটক মানুচ্চি তার ভ্রমণ কাহিনী Storia do Mogor বইতে শাজাহানের আরও খারাপ ছবি দিয়েছেন — দানবীয় কামুকতা, পশুবৎ উগ্র কামনা, লালসা চরিতার্থ করার জন্য নারীদেহ খোঁজ করা প্রভৃতি শাজাহানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল। এ বিষয়ে বিস্তৃত জানতে হলে কানওয়ার লাল এর The Taj (দি তাজ) বইটি পড়তে হবে।

অতি সংক্ষেপে যে ইংগিত দিতে চাই তার মূল কথা হল — আরজুমন্দবানু এবং শাজাহান কোন রোমিও জুলিয়েট জুটি ছিলেন বলে আপাতভাবে প্রমাণ হয় না। ফলে এত এত পত্নী এবং উপপত্নীর মধ্যে একজনের স্মৃতি রক্ষায় এত কাণ্ড করার ঘটনা ঘটতে পারে না।

আরজুমন্দবানুর মৃত্যু হয়েছিল বুরহানপুরে। ১৬২৯, ১৬৩০, ১৬৩১ কোন এক বছরে। সেখানে এক উদ্যানে তার সমাধি হয়। সেই সমাধি থেকে তাকে এনে আগ্রায় সমাধিস্থ করা হয়। বুরহানপুর থেকে আগ্রার দূরত্ব ৬০০ মাইল। সেই যুগের যানবাহনে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে অনুমান করতে হবে। মৃত্যুর ছয় মাস পরে বুরহানপুর থেকে শবদেহ আনা হয়। ১৬২৯, ১৬৩০, ১৬৩১ যে সালই তার মৃত্যু সাল হক না কেন — ছয় মাসের মধ্যে তাজমহল বানিয়ে তাঁকে সমাধিস্থ করা রূপকথাতেও সম্ভব নয়। তাহলে স্বাভাবিক অনুমান হল ছয় মাস পরে বুরহানপুর থেকে শবদেহ এনে আগ্রায় সমাধিস্থ করে তারপর তাজমহল নির্মাণ করা হয়। তাজমহল নির্মাণ করে শবদেহ আনা হয়নি। ১০ বছর বা ২২ বছর, তাজমহল নির্মাণ করতে যে সময়ই যাক না কেন বুরহানপুরে সমাধিতে এত বছর শবদেহ থাকা অসম্ভব। কারণ ঐ সমাধি পিরামিড ছিল না। তাই আগ্রায় আগে আরজুমন্দবানুকে সমাধিস্থ করা হয়েছে তারপর তাজমহল নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাজমহল শাহাজাহান নির্মাণ করেন নি। আগ্রায় তখনকার দিনের দুটি মর্মর প্রাসাদ মন্দিরের একটি দখল করেছিলেন। তাই সমসাময়িক ইতিহাসে তাজমহল নির্মাণের উল্লেখ নাই। সরকারী নথীতে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা লেখা আছে। সমসাময়িক ইতিহাসগুলি মধ্যে একমাত্র শাজাহানের সভাসদ ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লোহারীর প্রণীত বাদশানামায় তাজমহলের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তা থেকে প্রমাণিত হয় যে তাজমহল শাহাজাহানের অনন্য কীর্তি নয়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বাদশানামা আরবী অক্ষরে ফার্সী ভাষায় লেখা। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৪০৩ এবং ৪০৪ পৃষ্ঠায় তাজমহলের প্রকৃত ইতিহাস আছে। ড. রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারীর বইতে ঐ পৃষ্ঠা ২টির প্রতিলিপি মুদ্রিত আছে। উৎসাহী এবং কৌতুহলী পাঠক যদি আরবী জানা থাকে তবে তা পড়ে দেখতে পারেন। আমরা এখানে ঐ ফার্সীর বঙ্গানুবাদ দিচ্ছি। এই বঙ্গানুবাদ পি. এন. ওক-এর বই এবং ড. ব্রহ্মচারীর বইতে আছে।

২১. শুক্রবার, ১৫ই জমাদিয়াল আওয়াল, পরপারে যাত্রী পবিত্রা হজরৎ মমতাজ-উল-জামানির (আরজুমন্দবানুর নাম - লেখক) সেই পবিত্র মৃতদেহ।

২২. যা অস্থায়ী ভাবে কবরস্থ করা হয়েছিল, তা

২৩. যুবরাজ শাহসুজা বাহাদুর, ওয়াজর খাঁ এবং সতিউন্নেসা খানম, যারা

২৪. মৃতের মনমেজাজের ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল ছিল

২৫. এবং রাণীদের মনোভাব বুঝতো এবং তার কার্য্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিল,

২৬. তাদের সাহায্যে রাজধানী আকবরাবাদ (আগ্রা-লেখক) আনা হল এবং সম্রাট আদেশ দিলেন যে প্রত্যহ গরবী দুঃখী ও ফকিরদের মধ্যে জাকাত বিতরণ করা হক।

২৭. শহরের দক্ষিণে, যেখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল উদ্যান।

২৮. যার মাঝখানে সেই বিশাল ইমারৎ, যা পূর্বে রাজা মানসিংহের সম্পত্তি ছিল।

২৯. যার বর্তমান মালিক তার পৌত্র রাজা জয়সিংহ

৩০. সেখানেই স্বর্গবাসী রাণীকে কবরস্থ করা হবে স্থির করা হয়েছিল।

৩১. যদিও রাজা জয়সিংহ পূর্ব পুরুষের সেই সম্পত্তিকে অতিশয় মূল্যবান মনে করতেন, তথাপি সম্রাট শাহাজাহানকে তা বিনামূল্যে ছেড়ে দিতে রাজী হন।

৩২. কিন্তু, ধর্মীয় নিয়ম ও মৃতের প্রতি মর্যাদার কথা চিন্তা করে সতর্ক সম্রাট সেই প্রাসাদে বিনা পয়সায় নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না বিবেচনা করে শরীফাবাদ (নামক স্থানে) তাঁকে দিলেন।

৩৩. কাজেই সেই বিশাল প্রাসাদ (আলি মঞ্জিল) এর বদলে জয়সিংহকে সরকারী জমি দেওয়া হল।

৩৪. ১৫ই জমাদিয়ল আওয়াল শবদেহ আগ্রায় পৌঁছানোর পর

৩৫. তার পরের বছর সেই শোভন শবদেহকে চিরবিশ্রামে শায়িত করা হল।

৩৬. আকাশ চুম্বী মহিমান্বিত সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত রাজধানী উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা সরকারী আদেশে

৩৭. সেই পূণ্যবতী রমনীর দেহকে সাধারণের দৃষ্টির আড়াল করল এবং

৩৮. সেই আকাশ সমান গাম্ভীর্যপূর্ণ শীর্ষদেশে গম্বুজ শোভিত (ওয়া গম্বুজে) মহিমান্বিত বিশাল প্রাসাদ (ইমারৎ এ আলিসান)

৩৯. এক মহিমান্বিত স্মৃতি সৌধে পরিণত হল।

৪০. পরম শক্তিমান বাদশার ইচ্ছানুসারে অভিজ্ঞ ইমারৎবিদরা জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করল এবং

৪১. সেই প্রাসাদ নির্মাণের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করা হল।

বাদশানামা-র ঐ উদ্ধৃতি থেকে আমরা খুব সহজ বাংলায় এই আলোচনা ও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে,

(১) বুরহানপুর থেকে শবদেহ নিয়ে আসা এবং আগ্রায় সেটিকে সমাধিস্থ করার মধ্যে যে সময় লেগেছিল সেই সময়ের মধ্যে তাজমহল নির্মাণ অসম্ভব, অকল্পনীয়।

(২) সাবেক কোন সৌধকে অধিগ্রহণ করে বুরহানপুর থেকে নিয়ে আসা শবদেহকে সমাধিস্থ করা হয়। এই সেই সাবেক সৌধকে সমাধি সৌধের রূপ দিতে বছর খানিক সময় ও ৪০ লক্ষ টাকা লেগে থাকতে পারে।

(৩) পরে দীর্ঘসময় ধরে ১০ বছর, ১৮ বছর বা ২২ বছর যাই-ই হোক না কেন সেই সাবেক সৌধের বহু রকম পরিবর্তন ঘটিয়ে বহু রকমের অলংকরণ করে, কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করে তাকে বর্তমান রূপ দেওয়া হয় — যাকে সাধারণ ভাবে তাজমহল নির্মাণ বলা হয়ে থাকে।

(৪) যে সাবেক সৌধকে তাজমহল বানান হয়েছিল সেটি এক কালে একটি মন্দির প্রাসাদ ছিল এবং যা শ্বেতপাথরে নির্মিত।

(৫) শাহজাহানের সময়ে ঐ সৌধের মালিক ছিলেন রাজা জয়সিংহ।

(৬) সেই বিশাল সৌধ (আলিসান মঞ্জিল) গম্বুজ শোভিত (ওয়া গম্বুজে) ছিল

(৭) সম্রাট শাহাজাহান সেই সৌধকে প্রিয়তমা বেগমের সমাধি সৌধে রূপান্তরিত করতে মনস্থ করেন।

(৮) জয়সিংহ (রাজা মানসিংহের বংশধর) সেই সৌধ শাহজাহানকে বিনামূল্যে দিয়ে দিতে সম্মত হন।

(৯) কিন্তু ধর্মীয় বিধি নিষেধ ও মৃতের মর্যাদার কথা বিবেচনা করে সম্রাট এর বিনিময়ে শরীফাবাদ (এরকম কোন স্থানের কথা আগ্রায় পাওয়া যায় না) নামে কোন এক স্থানে জয়সিংহকে জমি দিলেন। প্রাসাদ অধিগৃহীত হল।

(১০) বুরহানপুর থেকে মৃতদেহ আনা হল আগ্রায়। মৃতদেহ আনার সময় সঙ্গে ছিল যুবরাজ শাহসুজা, ওয়াজির খাঁ এবং সতিউন্নেসা খানম।

(১১) ইতিমধ্যে ইমারত কারিগরেরা রাজা জয়সিংহের ঐ প্রাসাদকে কবরস্থানে রূপান্তরিত করার কাজ আরম্ভ করেন।

(১২) এই সব কাজ করতে প্রায় বছর খানেক সময় লেগেছিল — সেই সময়টা প্রত্যহ গরীব দুঃখী ও ফকিরদের জাকাত দেওয়া হত।

(১৩) মৃতদেহ আগ্রায় আনার এক বছরের মধ্যে রাজা জয়সিংহের ঐ প্রাসাদে পাকাপাকি ভাবে বেগমকে কবরস্থ করা হয়।

(ড. ব্রহ্মচারীর পুস্তক দ্রষ্টব্য)

পাঠকবর্গ নিশ্চয় খেয়াল করেছেন যে তাজমহল নির্মিত — এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ইতিহাসে কোন সমর্থন নাই। বরং তাজমহল যে শাজাহান - পূর্ব সৌধ সে সম্পর্কে বিস্তর প্রমাণ ও যুক্তি আছে। আমাদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে যারা তাজমহল নির্মাণে কৃতিত্ব শাহাজাহানকে দিয়েছেন তাদের স্বপক্ষে কিছু কল্পকাহিনী আছে কিন্তু কোন যুক্তি ও তথ্য সূত্র নাই। ভ্রমণকারীরা জানেন যে মাউন্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দির, অজন্তা-ইলোরার স্থাপত্য ভাস্কর্য, খাজুরাহোর স্থাপত্য ভাস্কর্যর তুলনায় তাজমহল কোন উল্লেখযোগ্য সৌধ নয়।

আকবরকে 'মহামতি' বানান, শাহাজাহানের কালকে স্বর্ণ যুগ বানানো — সবই

অনৈতিহাসিক ইতিহাস যা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পি. এন. ওকে-র পুস্তকে তাজমহল সৌধের কোন কোন বস্তুর কার্বন ১৪ পরীক্ষায় ফল ও উল্লিখিত আছে।

তাজমহল শব্দের অর্থ হল - আলয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলয় বলতে বাসস্থান বোঝায়। তাজমহলের প্রধান ফটকের উপর আছে নহবৎখানা। নিশ্চয় এক কালে ওখানে সানাই বাজত। কিন্তু কবরখানায় সানাই বাজানো অকল্পনীয়। নিস্তব্ধতাই কবরখানার বৈশিষ্ট্য।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে তাজ পরিসরে বাগানের নকসাও করেছেন এক কাশ্মীরী নাম রণমল।

তাজমহল যখন শিবমন্দির যুক্ত প্রাসাদ ছিল — তখন এই শিবের নাম ছিল তেজোলিঙ্গ এবং ঐ সৌধের নাম ছিল তেজো মহালয়।

(তাজমহল প্রসঙ্গ শেষ। কিন্তু ইতিহাস বিকৃতির ইতিহাস চলবে)

নিজের দেশ, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ এবং স্বাভিমান একটা জাতিকে বড় করে। জাতিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। মুসলমান পর্যটক আল-বিরুনী সেই সময়কার ভারতের হিন্দুদের মধ্যে সেই গর্ব ও স্বাভিমান লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন — হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, তাদের দেশের মত দেশ নেই। তাদের রাজার মত রাজা নাই, তাদের ধর্মের মত ধর্ম নাই, তাদের বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান নাই ইত্যাদি অথচ অনেকেই এই গর্ব ও স্বাভিমানকে হিন্দুদের পতনের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

(R. C. Mazumdar - The History and Culture of Indian people, Vol. - V, Page - 127)

আল বিরুনীর মন্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার হয় যে, দেশ, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হিন্দুদের এই স্বাভিমান - বহিরাগত মুসলিম আক্রমণকারীদের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা করছে। এই স্বাভিমানের ফলেই কোটি কোটি হিন্দু প্রাণ দিয়েছে - নির্যাতন সহ্য করেছে কিন্তু ভারতকে আরবায়িত বা ইসলামায়িত হতে দেয়নি। এই স্বাভিমান না থাকলে ইরাক, ইরান বা মিশরের মত ভারত একটি ঐশ্লামিক দেশে পরিণত হত।

এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে সাড়ে চুয়াত্তর (৭৪$^{১}/_{২}$) এর কথা আসে।

রাজপুতরা এই সাড়ে চুয়াত্তর (৭৪।।) সংখ্যাকে অত্যন্ত অভিশপ্ত বলে গণ্য করে। আজও কোন রাজপুত কোন চিঠি লিখে তার উপর ৭৪।। (সাড়ে চুয়াত্তর) লিখে দিলে প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ এই চিঠি খুললে তাকে পাপ স্পর্শ করবে। এই প্রথা বাংলা সহ ভারতের অনেক জায়গায় চালু হয়। অন্ততঃ আমাদের ছাত্রাবস্থায় আমরা এই ৭৪।। এর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। পাঠ্য পুস্তকের কোন একটিতে সম্ভবতঃ বাংলা ৭৪।। এর উপর একটি প্রবন্ধ ছিল। এখন 'সাড়ে চুয়াত্তর' বলতে উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত কোন হাস্যরসাত্মক বাংলা সিনেমার কথা আসে।

(২) সাবেক কোন সৌধকে অধিগ্রহণ করে বুরহানপুর থেকে নিয়ে আসা শবদেহকে সমাধিস্থ করা হয়। এই সেই সাবেক সৌধকে সমাধি সৌধের রূপ দিতে বছর খানিক সময় ও ৪০ লক্ষ টাকা লেগে থাকতে পারে।

(৩) পরে দীর্ঘসময় ধরে ১০ বছর, ১৮ বছর বা ২২ বছর যাই-ই হোক না কেন সেই সাবেক সৌধের বহু রকম পরিবর্তন ঘটিয়ে বহু রকমের অলংকরণ করে, কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ করে তাকে বর্তমান রূপ দেওয়া হয় — যাকে সাধারণ ভাবে তাজমহল নির্মাণ বলা হয়ে থাকে।

(৪) যে সাবেক সৌধকে তাজমহল বানান হয়েছিল সেটি এক কালে একটি মন্দির প্রাসাদ ছিল এবং যা শ্বেতপাথরে নির্মিত।

(৫) শাহজাহানের সময়ে ঐ সৌধের মালিক ছিলেন রাজা জয়সিংহ।

(৬) সেই বিশাল সৌধ (আলিসান মঞ্জিল) গম্বুজ শোভিত (ওয়া গম্বুজে) ছিল

(৭) সম্রাট শাহাজাহান সেই সৌধকে প্রিয়তমা বেগমের সমাধি সৌধে রূপান্তরিত করতে মনস্থ করেন।

(৮) জয়সিংহ (রাজা মানসিংহের বংশধর) সেই সৌধ শাহজাহানকে বিনামূল্যে দিয়ে দিতে সম্মত হন।

(৯) কিন্তু ধর্মীয় বিধি নিষেধ ও মৃতের মর্যাদার কথা বিবেচনা করে সম্রাট এর বিনিময়ে শরীফাবাদ (এরকম কোন স্থানের কথা আগ্রায় পাওয়া যায় না) নামে কোন এক স্থানে জয়সিংহকে জমি দিলেন। প্রাসাদ অধিগৃহীত হল।

(১০) বুরহানপুর থেকে মৃতদেহ আনা হল আগ্রায়। মৃতদেহ আনার সময় সঙ্গে ছিল যুবরাজ শাহসুজা, ওয়াজির খাঁ এবং সতিউন্নেসা খানম।

(১১) ইতিমধ্যে ইমারত কারিগরেরা রাজা জয়সিংহের ঐ প্রাসাদকে কবরস্থানে রূপান্তরিত করার কাজ আরম্ভ করেন।

(১২) এই সব কাজ করতে প্রায় বছর খানেক সময় লেগেছিল — সেই সময়টা প্রত্যহ গরীব দুঃখী ও ফকিরদের জাকাত দেওয়া হত।

(১৩) মৃতদেহ আগ্রায় আনার এক বছরের মধ্যে রাজা জয়সিংহের ঐ প্রাসাদে পাকাপাকি ভাবে বেগমকে কবরস্থ করা হয়।

(ড. ব্রহ্মচারীর পুস্তক দ্রষ্টব্য)

পাঠকবর্গ নিশ্চয় খেয়াল করেছেন যে তাজমহল নির্মিত — এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ইতিহাসে কোন সমর্থন নাই। বরং তাজমহল যে শাজাহান - পূর্ব সৌধ সে সম্পর্কে বিস্তর প্রমাণ ও যুক্তি আছে। আমাদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে যারা তাজমহল নির্মাণে কৃতিত্ব শাহাজাহানকে দিয়েছেন তাদের স্বপক্ষে কিছু কল্পকাহিনী আছে কিন্তু কোন যুক্তি ও তথ্য সূত্র নাই। ভ্রমণকারীরা জানেন যে মাউন্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দির, অজন্তা-ইলোরার স্থাপত্য ভাস্কর্য, খাজুরাহোর স্থাপত্য ভাস্কর্যর তুলনায় তাজমহল কোন উল্লেখযোগ্য সৌধ নয়।

আকবরকে 'মহামতি' বানান, শাহাজাহানের কালকে স্বর্ণ যুগ বানানো — সবই

অনৈতিহাসিক ইতিহাস যা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পি. এন. ওকে-র পুস্তকে তাজমহল সৌধের কোন কোন বস্তুর কার্বন ১৪ পরীক্ষায় ফল ও উল্লিখিত আছে।

তাজমহল শব্দের অর্থ হল - আলয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলয় বলতে বাসস্থান বোঝায়। তাজমহলের প্রধান ফটকের উপর আছে নহবৎখানা। নিশ্চয় এক কালে ওখানে সানাই বাজত। কিন্তু কবরখানায় সানাই বাজানো অকল্পনীয়। নিস্তব্ধতাই কবরখানার বৈশিষ্ট্য।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে তাজ পরিসরে বাগানের নকসাও করেছেন এক কাশ্মীরী নাম রণমল।

তাজমহল যখন শিবমন্দির যুক্ত প্রাসাদ ছিল — তখন এই শিবের নাম ছিল তেজোলিঙ্গ এবং ঐ সৌধের নাম ছিল তেজো মহালয়।

(তাজমহল প্রসঙ্গ শেষ। কিন্তু ইতিহাস বিকৃতির ইতিহাস চলবে)

নিজের দেশ, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ এবং স্বাভিমান একটা জাতিকে বড় করে। জাতিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। মুসলমান পর্যটক আল-বিরুনী সেই সময়কার ভারতের হিন্দুদের মধ্যে সেই গর্ব ও স্বাভিমান লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন — হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, তাদের দেশের মত দেশ নেই। তাদের রাজার মত রাজা নাই, তাদের ধর্মের মত ধর্ম নাই, তাদের বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান নাই ইত্যাদি অথচ অনেকেই এই গর্ব ও স্বাভিমানকে হিন্দুদের পতনের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

(R. C. Mazumdar - The History and Culture of Indian people, Vol. - V, Page - 127)

আল বিরুনীর মন্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার হয় যে, দেশ, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হিন্দুদের এই স্বাভিমান - বহিরাগত মুসলিম আক্রমণকারীদের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা করছে। এই স্বাভিমানের ফলেই কোটি কোটি হিন্দু প্রাণ দিয়েছে - নির্যাতন সহ্য করেছে কিন্তু ভারতকে আরবায়িত বা ইসলামায়িত হতে দেয়নি। এই স্বাভিমান না থাকলে ইরাক, ইরান বা মিশরের মত ভারত একটি ঐশ্লামিক দেশে পরিণত হত।

এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে সাড়ে চুয়াত্তর (৭৪১/২) এর কথা আসে।

রাজপুতরা এই সাড়ে চুয়াত্তর (৭৪।।) সংখ্যাকে অত্যন্ত অভিশপ্ত বলে গণ্য করে। আজও কোন রাজপুত কোন চিঠি লিখে তার উপর ৭৪।। (সাড়ে চুয়াত্তর) লিখে দিলে প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ এই চিঠি খুললে তাকে পাপ স্পর্শ করবে। এই প্রথা বাংলা সহ ভারতের অনেক জায়গায় চালু হয়। অন্ততঃ আমাদের ছাত্রাবস্থায় আমরা এই ৭৪।। এর সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। পাঠ্য পুস্তকের কোন একটিতে সম্ভবতঃ বাংলা ৭৪।। এর উপর একটি প্রবন্ধ ছিল। এখন 'সাড়ে চুয়াত্তর' বলতে উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত কোন হাস্যরসাত্মক বাংলা সিনেমার কথা আসে।

সাড়ে চুয়াত্তরের কাহিনীটি এই রকম। ১৫৬৭ সালে আকবর মেবারের রানা উদয় সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রানা উদয় ছিলেন মহারানা সংগ্রাম সিংহের পুত্র। সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ হয়েছিল ফতেপুর সিক্রীর কাছে খানুয়া নামক স্থানে। আকবর চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন। চার মাস পরেও চিতোরের পতন হল না। রাজপুতরা জয়মল এবং পট্ট নামে দুই সেনাপতির নেতৃত্বে দুর্গের বাইরে এসে যুদ্ধ করে বহু মোঘল সৈন্য ধ্বংস করেন। ক্রুদ্ধ আকবর চিতোর দুর্গের প্রাকার পর্যন্ত 'সাবাৎ' খোঁড়ার নির্দেশ দেন এবং বারুদ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুর্গের প্রাকারের এক অংশ ধ্বংস করা হল। দুর্গ রক্ষার সম্ভাবনা নাই দেখে রাজপুত রমনীরা জহরব্রত পালন করলেন। রাজপুত সৈন্যরা নিহত হলেন। এবং পরদিন মহামতি আকবর চিতোর দুর্গে প্রবেশ করে ৪০ হাজার অসামরিক প্রজা যারা দুর্গের মধ্যে যোদ্ধা রাজপুতদের সাহায্য করেছিল, তাদের হত্যার আদেশ দেন। ভিনসেন্ট স্মিথ তার Akbar the Great Mughul গ্রন্থে লিখেছেন The eight thousand Rajput Soldiers who formed the regular garrison having been zealously helped during the seize by 40 thousand peasants, the emperer ordered a general massacre, which resulted in the death of 30 thousand (page-90) ঐতিহাসিক Tod এই ধ্বংসলীলাকে বলেছেন most illiterate atrocities।

সেদিন ঠিক কত রাজপুত মারা পড়েছিলেন তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া সম্ভব ছিল না। আকবরের নিজস্ব ইতিহাসকার আবুল ফজল ৩০ হাজারের কথা লিখেছেন। আসল সংখ্যা কেউ গুনে দেখেনি। কত রাজপুত সেদিন মারা গেছেন তা জানতে সম্রাটও কৌতুহলী ছিলেন। তার আদেশ মত মৃতদেহগুলির পৈতে খুলে আনা হল। দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে পৈতের মোট ওজন পাওয়া যায় ৭৪।। মন। The recorded amount was 74½ mand of about 8 ounce each [smith. page - 91]

পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেব আদেশ দিয়েছেন যে প্রতিদিন এত হিন্দু মারতে হবে যাতে পৈতের ওজন সওয়া এক মন হয়। (PN Oak - Islamic Havoc in India, Page - 376)

তখন সব হিন্দু পৈতে ব্যবহার করতেন এবং পৈতের ওজন ছিল ৩ আউন্স মতন।

চিতোর দুর্গের সেই নির্বিচার গণহত্যার ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজপুতরা ৭৪।। (সাড়ে চুয়াত্তর) সংখ্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। ঐ ঘটনার পর থেকে মেবারের কোন রানা চিতোরগড় পা দেননি। রানা প্রতাপ এবং অন্যান্য রানারা উদয়পুরকে রাজধানী করেছিলেন।

মার্কস মেকলেপন্থী যারা ইতিহাস জগৎ, শিক্ষাজগৎ ও সংবাদমাধ্যম জগৎ দখল করে আছেন তারা এই সব ঘটনা ছাত্রদের জানান না। তারা কারবালা প্রান্তরের যুদ্ধের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন আর ৭৪।। নিয়ে হাস্যরসের সিনেমা করেন।

এই মার্কস মেকলেপন্থীরা ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে—

(১) বহিরাগত মুসলিম শাসনের যুগকে পরাধীনতার যুগ বলা চলবে না।

(২) এই বহিরাগতদের কাফের নিধনতত্ত্ব ও অংশীবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাস গোপন রাখতে হবে। (৩) ঐ সব আক্রমণকারীদের অত্যাচারের যুগকে সুবর্ণ যুগ বলতে হবে। (৪) হিন্দু ধর্মকে জাতিভেদ প্রথার দ্বারা কলংকিত বলে চিত্রিত করতে হবে। (৫) বিদেশী আক্রমণকারীরা খুব ভদ্র, মার্জিত, সংস্কৃতিবান, পরধর্ম সহিষ্ণু এবং হিন্দুদের থেকেও বড় বীর ছিলেন দেখাতে হবে। (৬) মুসলিম শাসনের যুগে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল, ইংরাজরা তা নষ্ট করেছে বলতে হবে। (৭) মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরীর লক্ষ লক্ষ ঘটনা বেমালুম চেপে যেতে হবে। (৮) জোর করে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করার ঘটনার উল্লেখ না করে প্রচার করতে হবে - বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং ইসলামের উদার ও মানসিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা স্বইচ্ছায় দলে দলে মুসলমান হয়েছে।

(ড. ব্রহ্মচারীর পুস্তক দ্রষ্টব্য)

'মহামতি' আকবরের মহামতিত্বের সামান্য নমুনা চিতোর দুর্গ দখলের সাড়ে চুয়াত্তরের কাহিনীর মধ্যে দিয়েছি। Akbar the great Mughal পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠায় ভিনসেন্ট স্মিথ পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন — আকবর একজন বিদেশী (Akbar was a foreigner in India - He had not a drop of Indian blood in his veins)। ভারতীয় ছাত্রদের কী শেখানো হয় আকবর সম্পর্কে ? কখনও কি তাকে একজন বিদেশী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে ? আকবর তার পৈত্রিক বংশধারায় তৈমুর লঙ্-এর এবং মাতার বংশধারায় চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকারী। তৈমুর ও চেঙ্গিসের উত্তরাধিকারী ভারতীয় মার্কস ও মেকেলপন্থী ঐতিহাসিকদের কাছে 'মহামতি'।

আকবরের নিষ্ঠুরতা, কাফের হত্যা, রমনী দুর্বলতা, বিশ্বাস ঘাতকতা কোনও অংশেই অন্য কোন বিদেশী আক্রমণকারীর থেকে কম ছিল না। আকবরের দীন-ইলাহী কোন উদার ধর্মমতও ছিল না। আকবর ক্ষমতা লিপ্সায় এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে গেছিলেন যে তিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রায় বিকল্প ভাবতে শুরু করেছিলেন। কোন ইসলামর পক্ষে এ তত্ত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তার ঘনিষ্ঠ সভাসদদের কয়েকজন ব্যতীত ঐ মতবাদ কেউ গ্রহণ করেনি এবং আকবরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদ লোপ পেয়ে যায়।

আকবরের সভাসদ ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেছেন যে, আকবর দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন (the handsom most man on the earth)। আবুল ফজলকে নির্লজ্জ চাটুকার আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ভিনসেন্ট স্মিথের বর্ণনায় আকবর দেখতে সুন্দর তো ছিলেনই না বরং বলা যায় দেখতে খারাপ ছিলেন। গায়ের রং কালো, উচ্চতায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, লম্বা বাহু, চওড়া বুক, সরু কোমর, পাগুলো একটু অন্যরকম যার জন্য হাঁটবার সময় মনে হত খোঁড়াচ্ছেন, বাম পা টেনে টেনে চলতেন, মাথাটা ডানদিকের কাঁধে হেলে থাকত, নাক ভোঁতা, নাকের ফুটো মটর দানার মতো - সব সময় যেন রাগী ভাব। স্মিথ আরও বলেছেন যে, তিনি সর্বদাই অত্যধিক বেশি পান করতেন। আকবরের সময়ে জেসুইট খৃষ্টান এ্যাকোয়াভিভার বর্ণনায় — তিনি পানীয়ের সঙ্গে আরক মিশিয়ে পান করতেন।

আকবর নিরক্ষর ছিলেন। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তার জন্ম। আর ১৫৫৬

তে সম্রাট। এই ১৪বছরে সম্রাট সন্তান পড়াশোনা করার সুযোগ পেলেন না ? না পান নি। কারণ আকবর সম্রাট হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই আড়ালে থাকতেন। জেসুইট ফাদার এ্যাকোয়াভিভা এর জন্য আকবরের উপর বিরক্তও হতেন। মহিলাদের সঙ্গে ২৪ ঘন্টা কাটানো এ্যাকোয়াভিভা ভাল চোখে দেখতেন না। আবুল ফজল লিখেছেন যে আকবরের হারেমে ৫ হাজার রমনী থাকত। একটা পানশালা ছিল সেখানে কতজন যে রোজ আসত তার সংখ্যা করা যায় না। কোন সভাসদ কোন কুমারীর সঙ্গ পেতে চাইলে সম্রাটের অনুমতি নিতে হত। সম্রাটও কখনো কখনো ঐ সব রমনীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন — কে তাদের কুমারীত্ব হরণ করেছে। হারেমের ঐ মহিলারা ছিলেন নিশ্চিতভাবে হিন্দু রমনী - যাদের যুদ্ধের পর অধিকার করা হত। মিনা বাজার নামে যে মহিলা বিক্রয়ের বাজার বসত সেখানেও হিন্দু রমনীদেরই আনা হত দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে।

এ প্রসঙ্গে রণথম্ভোর চুক্তি বিশেষ ইংগিতবহ। এই চুক্তির প্রথম শর্ত ছিল বন্দী কোন রমনীকে মুঘল হারেমে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আবুল ফজলের বর্ণনায় আকবরের যদি সভাসদদের বেগমদের কাউকে পছন্দ হত তাহলে তাকে তার হারেমে এক মাসের জন্য পাঠাতে হত। তেমন কাউকে পছন্দ হলে - তাকে তালাক দেওয়াতে বাধ্য করতেন আকবর। স্মিথ লিখেছেন — **Akbar, throughout his life, allowed himself ample latitude in the matter of wives and concubines**। নিজের অভিভাবক বৈরাম খাঁর স্ত্রীকে আকবর বিবাহ করেছিলেন - বৈরামকে হত্যার পর।

ভিনসেন্ট স্মিথের বইতে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে (পৃ. ১৩)। জয়মলকে কোন একটি কাজে পাঠান হয়েছিল। পথে জয়মলের মৃত্যু হয়। জয়মলের স্ত্রী চিতায় প্রাণ বিসর্জনের মনস্থ করেন। কিন্তু আকবরের লোকেরা তাকে করতে দেয়নি। ব্যাপারটা ঐতিহাসিকরা আকবরের সতীপ্রথা বিরোধী মহানুভবতার উদাহরণ হিসাবে চালিয়ে দেন। কিন্তু বাস্তব হল — জয়মল পত্নীকে হারেমে আনার জন্য জয়মলকে কাজের নাম করে দূরে পাঠান হয় এবং পথে তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়। আকবরের নিষ্ঠুরতার অমানবিকতার হিসাব পেতে গেলে তৈমুর এবং চেঙ্গিস শুধু নয় তার বাবা সম্রাট হুমায়ুনের কথাতেও আসত হয়। হুমায়ুন সারাটা জীবন ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। হুমায়ুন আকবর হয়ে তা শাহাজাহান ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত আরও বীভৎস রূপ নিয়েছিল। ভাই কামরানকে বন্দী করে যখন হুমায়ুনের কাছে আনা হল — তখন তার পাগুলো চেপে ধরে চোখের মধ্যে তলোয়ার ঢুকিয়ে দেওয়া হল - তারপর সেই চোখে লেবুর রস ও নুন ছড়িয়ে দিয়ে ঘোড়ায় চাপিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। (ভিনসেন্ট স্মিথ, পৃ. ২০)। কামরানের ছেলেকে (আকবরের খুড়তুতো ভাই) আকবর ১৫৬৫তে হত্যা করেন।

১৫৫৬তে পানিপথের যুদ্ধের পর যখন বিক্রমাদিত্য হিমুকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আকবরের সামনে আনা হল — তখন হিমুর ঘাড়ে তরবারীর আঘাত করে তাকে হত্যা করলেন আকবর। এই কাফের নিধনের মধ্যেমে তিনি গাজী হলেন। তখন তার বয়স মাত্র ১৪।

আবুল ফজলের লেখা থেকে পাওয়া যায় যে, মহম্মদ মিকরকে ৫ দিন ধরে হাতির শুঁড়ে প্যাঁচানো হয়েছিল - তারপর হত্যা করা হয়। আহমেদাবাদের শাসক মুজাফফর শাহর

লোকেজনকে হাতির পদতলে পিষ্ট করে হত্যা করার আদেশ দেন আকবর। আকবরের আদেশে সুরাটের হামজাবানের জিহ্বা কেটে নেওয়া হয়। মাসুদ হুসেন মির্জার চোখের পাতা সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। তার তিন শত সমর্থকের শরীরের চামড়া খুলে নিয়ে গাধার, শূকরের কুকুরের চামড়া লাগানো হয়েছিল।

অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার এরকম হাজার হাজার কাহিনী মুসলিম ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। তবু আকবর 'মহামতি' আকবর। ধূর্ত ঐতিহাসিকরা বারবার বলে আসছেন যে আকবর অন্যান্য বিদেশী মুসলিম শাকদের মত ছিলেন না। তিনি হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু জাতিকে ঘৃণা করতেন না। সমস্ত প্রজাদের সমান চোখে দেখতেন ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে এই সব কাল্পনিক কাহিনী কোথা থেকে তারা পেলেন বোঝা যায় না। আকবর আলাউদ্দিন বা ঔরঙ্গজেবের মত ছিলেন না ঠিকই তবে হিন্দু প্রীতির কোন ঘটনা তো শোনা যায় না। আকবর এটা লক্ষ্য করেছিলেন তার পূর্ববর্তী শাসকরা হিন্দুদের উপর ধর্মের নামে যখনই কোন অত্যাচার করেছে তখনই তার প্রতিক্রিয়ায় বিদ্রোহ হয়েছে। হিন্দুর ক্রোধাগ্নি সুলতানীকে রিক্ত করেছে। তাই তিনি নিজের রাজত্ব চালাবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান সমস্ত প্রজার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে কিছুটা নরম। কাফের নয় — হিন্দু মুসলমান সমান একথা কখনও বলেন নি। হিন্দুদের নমস্কার জানাতে হলে বলতে হত — আল্লাহ্ আকবর।

আকবরের সময়ে ইউরোপ, আফ্রিকা বা এশিয়ায় যে সব সম্রাট রাজত্ব করেছেন, তাদের তুলনায় আকবর শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তার কূটনৈতিক দক্ষতা, রাজনৈতিক কৌশল, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সবই ছিল সেই কালে সেরা। কিন্তু 'মহামতি' বলা ইতিহাসের অপলাপ।

হয় মুষিক বৃদ্ধি, না হয় গজ ক্ষয়

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় প্রচার হল যে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার ও অবহেলায় জর্জরিত হয়ে এদেশের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। এই প্রবাদটা হিন্দু বিরোধী তথাকথিত সেকুল্যাবাদী ইন্ডিয়ানদের সংখ্যালঘু তোষণের রাজনৈতিক লাইনকে শক্তিশালী করার একটা অস্ত্র।

ওদের যদি প্রশ্ন করা হয় — (১) ইরাক, ইরাণ, পারস্য, মিশর এবং আফ্রিকার বহু দেশেই তো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার ছিল না - তবে ঐ দেশগুলি ইসলামায়িত হল কেন এবং কী করে ? ও সব দেশে তো ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথা ছিল না এবং ১০০ শতাংশ ইসলামীকরণ হল কী করে ? (২) গ্রীস রোম প্রভৃতি দেশ স্বদেশের ধর্ম ছেড়ে খৃষ্ট ধর্ম নিল কেন ? ওখানে তো ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের প্রবর্তিত জাতিভেদ প্রথা ছিল না। (৩) দেশের বৌদ্ধদের মধ্যে তো জাতিভেদ বা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার করার সুযোগ নাই - তবু বৌদ্ধরা মুসলমান হল কেন ? যে মুণ্ডিত মস্তক এবং লুঙ্গির মত করে কাপড় পরা বৌদ্ধরা মুসলমান হয়ে ছিল তাদের 'নেড়ে' বা 'নেড়ে মুসলমান' বলে অভিহিত করা হত। ভারতের অন্যান্য অংশে যখন বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল

তখন ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে অনেক বৌদ্ধ বাংলাদেশে চলে আসে কারণ বাংলায় পাল রাজাদের দাক্ষিণ্যে বৌদ্ধ ধর্ম টিকে ছিল। বাংলায় বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বাস করতেন। পরে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে যখন ব্যাপকভাবে ইসলামীকরণের পবিত্রকাজ চলতে থাকে তখন বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আপত্তি করেনি। ইসলাম তরবারীর সাহায্যেই (মুখেই) ব্যাপকতা পেয়েছে — ধর্মশাস্ত্র পড়ে নয়। বাংলাদেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ- কোরাণ হাদিশ পাঠ নয়। আর সারা দেশে ইসলামীকরণের কাজ কোরাণ হাদিশ পড়িয়ে করা হয়নি।

উচ্ছিষ্ট লোভী বহু বুদ্ধিজীবী জানেন যে তারা হিন্দু বলেই হিন্দু ধর্মকে নিন্দা করার অবাধ সুযোগ পেয়েছেন। ইসলামী হলে এবং ইসলামের নিন্দা করলে - তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারী হয়ে যেত।

ভারতের মুসলমানদের অতীত ইতিহাস খুঁজলে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাবে তাদের পিতৃ পুরুষ হিন্দু ছিলেন এবং তরবারির মুখে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছেন। লুঠ হওয়া হিন্দু নারীদের সাহায্যেও বহু ইসলামীর জন্ম হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে একথা সত্য যে মহম্মদ যখন মক্কাবাসী ছিলেন তখন আরবের কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করলে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে — এই শর্তে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু মদিনায় আমরা অন্য চিত্র দেখি। মক্কার ধর্মপ্রচারক মহম্মদ, মদিনায় হয়ে গেলেন — শাসক, সেনাধ্যক্ষ এবং বিচারক। লুন্ঠিত বা অর্জিত ধনসম্পদের একটি নির্দিষ্ট ভাগ তার প্রাপ্য হিসাবে অনুমোদিত হল।

হিন্দু বিদ্বেষী হিন্দুরা প্রায়শই বলেন যে, হিন্দু ধর্মে ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান থাকায় নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। হিন্দু ধর্মকে অনেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ বলে ঘৃণাও করেন। বিকল্পে তাঁরা ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মকে সাম্যবাদী ধর্ম বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু হিস্ট্রি অফ ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া বইতে তারাচাঁদ উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৩১ সালের আগের জন গণণা রিপোর্টে মুসলমানদের মধ্যে বহুরকম জাত-এর উল্লেখ দেখা যায়। আমরা একথাও জানি যে, সৈয়দরা মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের মত স্থান পেয়ে থাকেন। এই সব সৈয়দদের বেশীর ভাগই পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত। ধর্মান্তরিত হয়ে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সৈয়দ হওয়া যায় না। তাদের অনেকেই সেখ বা নব মুসলমান। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান বনে যাওয়ার পর নিচু জাতের মুসলমান বলে গণ্য হতেন।

বর্ণাশ্রম প্রথা হিন্দু শাস্ত্র ও সমাজে প্রচলিত থাকলেও জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা হিন্দু শাস্ত্রে নেই। এদেশে মুসলিম আক্রমণের আগে বর্ণাশ্রম ছিল ঠিকই কিন্তু হিন্দু জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতা ছিল না।

বর্ণাশ্রম, সঠিক ভাবে বলতে গেলে, এক ধরণের 'শ্রম বিভাগ' - যা বর্তমানে সমাজেও চালু আছে - চালু থাকার প্রয়োজনও আছে। সরকারী ও বেসরকারী কর্মীদের মধ্যে আজ যে শ্রেণী বিভাগ রয়েছে - তা বর্ণাশ্রমই এবং তা সাম্যবাদী এবং পুঁজিবাদী সব দেশেই স্বাভাবিক ভাবেই আছে।

নানা কারণের মধ্যে বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা - জাতিভেদ প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। ইউরোপের 'গিল্ড' ব্যবস্থার মত। একই পেশা একই শিক্ষাকর্ম বা একই কুটীর শিল্প বছরের পর বছর ধরে বংশ পরম্পরায় করতে করতে এই জাতি ব্যবস্থা বা গিল্ড ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করে। যন্ত্র ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবহারে এই গিল্ড ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। কলু, কামার, তাঁতী, কুমার, গোয়ালা এক একটি গিল্ড - যা একশত বছর আগেও বেশ স্পষ্ট ছিল। কিন্তু যন্ত্র প্রবেশ করায় এই গিল্ড ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ডেয়ারিতে দুধ পাওয়া যাচ্ছে, শাবল-কোদাল-গাঁইতি কারখানায় তৈরী হচ্ছে। কাপড়তো অনেক কাল আগে থেকেই কলে তৈরী হচ্ছে।

পুরোহিত পেশার গিল্ড ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে। সেখানে আর কাউকে ব্রাহ্মণরা ঢুকতে দেয় না। (এখন অবশ্য অব্রাহ্মণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পুরোহিত বানানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের গিল্ডে অব্রাহ্মণ প্রবেশ করতে চাইছে।) একইভাবে গোয়ালাদের গিল্ড, কামারদের গিল্ড, তাঁতীদের গিল্ড ভেঙ্গে পড়েছে।

অতি প্রাচীন এই হিন্দু সমাজে কালক্রমে আগাছা জন্মেছে, রং নষ্ট হয়েছে, পলেস্তরা খসেছে - কিন্তু এই অতি প্রাচীন সনাতন ধর্মেই (হিন্দু ধর্ম) একমাত্র মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে অমানবিক করা হয়নি। সবাইকেই অমৃতের পুত্র এবং অমৃতের অধিকারী বলে গণ্য করা হয়েছে, সকলেরই সুখ ও মঙ্গল কামনা করা হয়েছে, সকলেরই নিরাময় কামনা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে খ্রিস্টান ও ইসলাম মানুষে মানুষে বিস্তর ব্যবধান ও বিভেদ করা হয়েছে। জাতিভেদ প্রথায় কোথাও নিম্নবর্ণের মানুষদের হত্যা করার ব্যবস্থা নাই। অপরপক্ষে অন্যান্য ধর্মে অন্য ধর্মের মানুষদের হত্যা করারও শাস্ত্রীয় বিধান আছে। সমগ্র মানবজাতিকে 'বিশ্বাসী' ও 'অবিশ্বাসী' দুই দলে ভাগ করা হয়েছে। পৃথিবীর ভূখণ্ডকে 'পবিত্র ভূখণ্ড' এবং 'অপবিত্র' ভূখণ্ডে' ভাগ করা হয়েছে। হিমালয় পর্বতের পিছন দিকে অবস্থিত দেশগুলিতে বিভিন্ন সময় যে সব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে - সেই সব ধর্মে শাস্ত্রীয় ভাবেই অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি পক্ষপাত, ঘৃণা ও অবিচারের বিধান আছে। সকলের প্রতি ন্যায় অস্বীকার করা হয়েছে। বাইবেল-এর 'গড' যথেষ্ট হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার কথা বলেছেন। মোজেস, যশুয়া বা খৃষ্ট কেউই বাইবেলে আস্থা রাখেন না এমন মানুষদের প্রতি উদার আচরণের নির্দেশ দেন নি। অখৃষ্টানরা পশু, তারা নরকের আগুনে স্থান পাবে ইত্যাদি। খৃষ্টকে অনুসরণ করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে। যে যীশুর শরণাপন্ন হবে না তার পরিত্রাণ নাই। এরকম বহু বাণীই আছে। অর্থাৎ যত মত তত পথ - খ্রিস্টান বা ইহুদীরা বিশ্বাস করেন না। ইসলামীরাও বিশ্বাস করেন না। তাদের বিশ্বাস হল - আল্লাহর পথই একমাত্র পথ। অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসী করার কাজই ধর্মান্তর করণ। প্রলোভন এবং ভীতি এই দুটি বড় হাতিয়ার। "সকল মানুষই আমার কাছে সমান, কেউ আমার প্রিয় পাত্রও নয়, কেউ বিদ্বেষভাজনও নয়" — একথা বলার মত শাস্ত্র (গীতা) বা ঈশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্বে বিশ্বাসী ম্যাক্সমূলার ৪০০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের আগের কথা ভাবতেই পারেন না। তার ধর্মীয় বিশ্বাস হল ঐ সময়ে গড় পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ভারতীয় দর্শনের

আদি, অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ধারণা তার নিজস্ব দর্শনের উপলব্ধিতেই ছিল না। বরাত পেয়ে ছিলেন অর্থের বিনিময়ে - ভারতীয় বিষয়ে লেখার। লিখেছিলেনও। তাই আর্য আক্রমণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন - সেই কাল্পনিক তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়েছেন ইন্ডিয়ানদের। খৃষ্ট জন্মের ৪০০০ বছর আগেও যে পৃথিবী থাকতে পারে তাতে মানুষ থাকতে পারে, তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস থাকতে পারে তা ম্যাক্সমূলারের খৃষ্টীয় চিন্তা সীমার বাইরে। নিজেদের দেশের বর্বরতার ইতিহাস চাপিয়ে দিয়েছেন ভারতের উপরে। যা তার জ্ঞানের অগম্য তাই ব্যাখ্যা করেছেন — 'হয় মূষিক বৃদ্ধি, নতুবা গজ ক্ষয়' বিদ্যা দিয়ে।

মূষিক বৃদ্ধি, গজ ক্ষয় তত্ত্বটি কী ? একটা গল্প শুনুন। এক দেশে একবার একটি জানোয়ার দেখা গেল, যে জানোয়ারটিকে ঐ দেশে আগে কখনও দেখা যায় নি। রাজা উদ্বিগ্ন হলেন। এ কেমন জানোয়োর। এল কোথা থেকে ? রাজার সভায় বেশ কিছু পণ্ডিত ছিলেন। রাজা বিশ্বাস করতেন এবং পণ্ডিতরাও বিশ্বাস করতেন যে তারা জানেন না এমন কিছু নেই এবং হতে পারে না। রাজা পণ্ডিতদের মধ্যে সেরা পণ্ডিতকে ডাকলেন। পণ্ডিত এলেন। রাজা জানোয়ারটিকে দেখিয়ে পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করলেন — এই জীবটি কী ? এ এল কোথা থেকে ? পণ্ডিত মশাইও হতবাক্ ! এ আবার কী রকম জীব ? এ ধরণের জীব এর দেখা পাওয়া যায় নি, শাস্ত্রে কোথাও নেইও, তাহলে ? কিন্তু রাজাকে তো উত্তর দিতে হবে। প্রতি মাসে এতগুলি মোহর, তাছাড়া এত সম্মান - উত্তর না দিতে পারলে তো সব কিছু নিয়ে টানাটানি পড়বে। বিষয়ী পণ্ডিত রাজার কাছ থেকে দুইদিন সময় নিলেন। শাস্ত্রাদি ঘেঁটে দেখবেন -এই জীবের নাম কী ? কোথা থেকে এল ?

দুইদিন অপেক্ষায় কাটল। তৃতীয় দিনে পণ্ডিত মশাই এলেন। জীবটিকে আবার দেখলেন। রাজা মশাই উৎকণ্ঠিত এবং আকুল। জিজ্ঞেস করলেন, কী বুঝলেন রাজপণ্ডিত? পণ্ডিত মশাই বলেনে, মহারাজ, শাস্ত্রাদি ঘেঁটে যা বুঝলাম তা হল — এই জীবটি হয় মূষিক বৃদ্ধি নতুবা গজ ক্ষয়। অর্থাৎ হয় কোন মূষিক অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে এই আকার পেয়েছে অথবা কোন গজ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে এই কলেবর পেয়েছে। এর বাইরে আর কিছু হতে পারে না।

রাজা বা পণ্ডিত এমন অনেকেই আছে যারা 'বরাহ' নামে জীবটি সম্পর্কে অজ্ঞ। কিন্তু অজ্ঞতা প্রকাশ সম্মানহানিকর মনে করেন। তাই বরাহ দেখলে বলেন - হয় মূষিক বৃদ্ধি, না হয় গজ ক্ষয়।

ম্যাক্সমূলার এবং তার মত অনেক পণ্ডিতই কেবলমাত্র মানচিত্রে ভারতবর্ষ দর্শন করে - ভারতের ইতিহাস, ভারতের শাস্ত্রাদি সম্পর্কে পারঙ্গমতায় আখ্যা পেয়েছেন রাজাদের কাছে। তাদের মোহর এবং সম্মান দুটোই প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল অজ্ঞানতা গোপন করার। তাই তারা 'মূষিক বৃদ্ধি, গজ ক্ষয়' তত্ত্ব দিয়েই কাজ সেরেছেন। আমরাও এত মোহর ও সম্মান পাওয়া পণ্ডিতদের কথা বিশ্বাস না করেই বা কোথায় যাব ?